هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة

التأليف : محمد سلطان المعصومي الخندجي المكي

الترجمة : مزمل الحق بن عبد السلام

المراجعة : أكرم الزمان بن عبد السلام

মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণে বাধ্য

মূল : মুহাম্মাদ সুলতান আল-মাসুমী আল-খুজান্দী আল-মাক্কী,

শিক্ষক, আল-মাসজিদুল হারাম।

অনুবাদ : মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক বিন আবদুস সালাম

লীসান্স, হাদীস- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনা : আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ করতে বাধ্য?

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ 7112762, 01711-646396

প্রথম প্রকাশ ঃ রমাযান ১৪২৮ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০০৭

মুদ্রণে ঃ হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

গ্রাফিক্স ঃ কম্পোজ সেটিং ও মুদ্রণ সহযোগিতা
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ 7112762, 01711-646396

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র।

Muslim ki Char Mazhaber Kono Aktir Onusorone Baddho
Translated by : Muhammad Muzzamil Haque Bin Abdus Salam, *Edited by :* Akramuzzaman Bin Abdus Salam *Published by :* Tawheed Publications 90, Hazi Abdullah Sarkar lane Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01711646396
Price : Sixty Taka Only.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের প্রারম্ভিক দু'আ–

হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী! আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করছে, তার ফায়সালা তো আপনিই এক দিন করবেন। মতভেদপূর্ণ বিষয়ে যা হক্ব সেদিকে আপনার ইচ্ছায় আমাদেরকে সুপথ দেখান। আপনিইতো যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথের উপর চলার তাওফীক্ব দিয়ে থাকেন। আর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার পরিজন ও সহচরবৃন্দের উপর।

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিপতি। শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক সম্মানিত রসূল ﷺ'র প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সহচর এবং সকল মুসলিমের প্রতি। অতঃপর–

নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদী উম্মাত এক ও অখণ্ড উম্মাত। আল্লাহ এ উম্মাতকে তার ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলাদসৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন এ ভাষায় ঃ-

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ (آل عمران١٠٣)

"তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হইও না। (আলু ইমরান ১০৩)

তিনি উম্মাতের জন্যে এ ঐক্যের ভিত্তি ও তার উপাদানসমূহ নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, তার রব ও ইলাহ এক এবং নাবী আর কিবলা এক। এবং গন্তব্যও এক। এতদসত্ত্বেও এ উম্মাত কেবলমাত্র দল ও দলাদলির পথই বেছে নিয়েছে, একমাত্র তারা ব্যতীত যাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেছেন। ফলে রসূল ﷺ যা বলেছিলেন, তা বাস্তবে ঘটে গেছে। "নিশ্চয়ই বানী ইসরাঈল অন্য বর্ণনায় আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত তিহত্তোর দলে বিভক্ত হবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তির পূজারী হবে)। একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রসূল ﷺ! নাজাত প্রাপ্ত দলটি কোন্‌টি? রসূল ﷺ বললেন, আমি ও আমার ছহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। অপর বর্ণনায় এসেছে ঐটি হল 'জামা'আত'। অন্য বর্ণনায় 'মিল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'ফিরকাহ' আছে। হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। (সহীহ জামে হা/ ৫২১৯; সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩/২০৪/১৩৪৮ পৃঃ)

মুসলিম উম্মাতের চার মাযহাবে বিভক্ত হওয়াটা যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত হলেও যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হয় নি, তাই নির্ভরযোগ্য আলিমগণ চার মাযহাবকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর মধ্যে গণ্য করেছেন। সুতরাং অবশ্যই এতে উপকারের দিকও কিছু রয়েছে। কিন্তু এ উপকারগুলো কেবল তাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব যারা কোন একটিতে ভর্তি

হয়ে তার অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত হয় নি। কেননা নবোদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও মাস'আলায় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে অনেক সমাধান এসেছে। যে কোন মাযহাব মুক্ত শিক্ষক আলিম ইচ্ছা করলে ৪ মাযহাবের যাবতীয় কিতাব ঘেটে তুলনামুলক অধিক বিশুদ্ধ সমাধান বের করে নিজে আমাল করতে পারেন ও অপরকে এ বিষয়ে জানাতে পারেন। কিন্তু যারা নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হয়েছে তাদের জন্য মাযহাব উপকারের চেয়ে অপকারই বয়ে আনে বেশী।

এমনকি কিছু সংখ্যক মাযহাবী ব্যক্তির গোঁড়ামীর দৌরাত্য এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তাদের আক্বীদাহ ও 'আমলের মধ্যে সত্যচুতি ও বিভ্রান্তিপথভ্রষ্ট দলসমূহের চেয়ে মোটেও কম নয়।

তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী প্রযোজ্য যে, তারা তাদের দরবেশ ও পাদ্রীদেরকে এবং মসীহ ইবনে মারইয়ামকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ করেছে- (সূরা তাওবাহ ঃ ৩১)। যেমন তাদের অনেককে এমন পাবেন যে, যখন আপনি পবিত্র কুরআন- এর কোন আয়াত অথবা নাবী কারীম ﷺ কর্তৃক সহীহ সনদে প্রমাণিত কোন হাদীস দ্বারা কোন বিষয়ে তাদের নিকট দলীল উপস্থাপন করবেন, যা তাদের ঈমামের সনদ বিহীন কথার বিরোধী, তখন তাদেরকে তাদের ইমামের কথার উপর অবিচল পাবেন। আর তারা উক্ত দলীলের ক্ষেত্রে দূরবর্তী ভ্রান্ত অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, যা সত্যের ধারে কাছেও নয়। এমনকি কখনো কখনো অনুমান, অন্যায় ও অহঙ্কারবশে তারা এর মানসুখ হওয়ারও দাবী করেন। কুরআন ও হাদীসের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। আর এ গোঁড়ামি এক মাযহাব হতে অপর মাযহাবে তীব্র ও হালকা, কম ও বেশীর দিক থেকে তারতম্য হয়ে থাকে।

আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চললে ও যাবতীয় 'আমাল-ইবাদতে ঐ দু'টির দলীলের অনুসরণ করলে সঠিক পথে থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসারীরা 'আমাল ইবাদাতের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের প্রমাণ তলব ও অনুসন্ধান না করে মাযহাবের অন্ধ অনুসারী (মুকাল্লিদ) হওয়ার ও বানানোর জন্য কুরআন ও হাদীস চষে অনেক দলীল একত্র করেন। এমনকি অনেক জ্ঞানপাপী এ বিষয়ে গবেষণামূলক বইও লিখেছেন।[১] ইন্না

[১] যেমন ঃ "মাযহাব মানি কেন?" মুফতী রফীকুল ইসলাম মাদানী- (মাহরুমুন-মিন বারকাতিল মাদীনাহ)

লিল্লাহি........। এসব বই এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বলব। "এগুলো বিভিন্ন বাত্বিল দর্শন, মতাদর্শ ও দল মতের সমর্থনে লিখিত গবেষণা ধর্মী বই এর মত, যাতে কুরআন হাদীসের অনেক দলীল থাকে, অনেক অকাট্য যুক্তি ও জ্ঞান থাকে। যেমন কাদিয়ানীদের বিভিন্ন বই, শী'আদের বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক বই। অথচ তাক্বলীদ এর সংজ্ঞা ও দাবী অনুযায়ী অন্ধ অনুসরণ- এটা শুধু শিশু ও পশুর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তাক্বলীদ এর দর্শনের ব্যাপকতা এত বেশী যে, আমাদের দেশের জনগণের বিচারে বড় বড় 'আলিম অহঙ্কার ও গর্বের সাথে বরণ করে থাকেন ও নিজেকে মুকাল্লিদ বলে পরিচয় দিয়ে খুশী হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

মাযহাবসমূহের উৎপত্তি লগ্ন থেকে এ গোঁড়ামি দ্বীন ও তার অনুসারীদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। লেখক এ মাযহাবী গোঁড়ামির বাস্তব চিত্র তুরে ধরেছেন, যার ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও ক্ষতিসমূহের মধ্যে রয়েছে কিছু জাপানী লোকের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়ার পর তা গ্রহণ করা থেকে বিরত হওয়ার ঘটনা। যখন তাঁদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তুতি ও আগ্রহ জানা গেল, তখন সেখানে উপস্থিত সকল মাযহাবীরা স্বীয় মাযহাবের প্রতি তাঁদেরকে আহ্বান জানাল। তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। যে সময় তাঁরা ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, সে সময় তারা তাদেরকে এ মাযহাব সমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ফলে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করা হতে পশ্চাৎমুখ হয়ে যান।

এ ঘটনার পর কিছু সংখ্যক (জাপানী) ভাই মাযহাব, তার মূলনীতি ইসলামে তার স্থান ও নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিঠি মারফত প্রশ্ন করেন। লেখক তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে এ গ্রন্থটি লেখেন। "মুসলিম কি চার মাযহাবের নির্দিষ্ট এক মাযহাব অনুসরণ করতে বাধ্য?

এ গ্রন্থটি মাযহাবসমূহ, এর মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও নিস্প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে মুসমিদের মধ্যে বিশেষ করে চার মাযহাব এর মধ্যে প্রচার হওয়া দরকার। কেননা এর

"মাযহাব কী ও কেন?" মাওলানা তাকী উসমানী।
"মাযহাব মানব কেন?" মুফতী আব্দুল্লাহ।

মধ্যে অনেক উপাকারিতা হয়েছে। এবং প্রকৃত সত্য গ্রহণে ও গোঁড়ামি বর্জনের উপায়সমূহের দিক নির্দেশনা রয়েছে।

এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমার সহোদর ভাই মুয্যাম্মিল হক বিন আবদুস সালাম। এ গ্রন্থ পাঠে যেন বাংলা ভাষাভায়ীরা উপকৃত হন এবং কিতাব, সুন্নাহ ও স্বয়ং ইমামগণের উপদেশের মানদণ্ডে চার মাযহাবের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেন এ দু'আ করি। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এও প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন এ অনুবাদ দ্বারা ব্যাপক উপকার সাধন করেন যেমন তিনি এর মূল গ্রন্থ দ্বারা উপকার সাধন করেছেন। আল্লাহ লেখক ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন এবং এর দ্বারা তাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী করুন এবং এ গ্রন্থটি মূদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত ও সহযোগী সবাইকে কল্যাণ দান করুন– আমীন!

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
লীসান্স ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদীনাহ।
সাবেক পরিচালক, দাওয়া ও তালীম বিভাগ:
জমঈয়াতু এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামী কুয়েত
বাংলাদেশ অফিস।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পাঠক সমীপে অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। তিনি আমাদেরকে নাবী সরদার রসূলে আকরাম মুহাম্মাদ ﷺ'র উম্মাত বানিয়েছেন এবং সেই সাথে তাঁর অনুসারী হওয়ারও তাওফীক প্রদান করেছেন। অতএব শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য বলি- ফালহামদুলিল্লাহি আওয়ালান ওয়া আখিরান। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রসূল ﷺ'র প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যাঁরাই তাঁদেরকে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

দ্বীনে ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয় দানের জন্য মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূল হিসাবে নির্বাচন করে হিদায়াত ও দ্বীনে হাক্ব সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সফ্ফ ঃ ৯)

অতএব তিনিই বিশ্ব মুসলিমের জন্য একমাত্র রসূল ও একমাত্র ইমাম (নেতা) তথা ইমামগণেরও ইমাম। তিনিই একমাত্র নিষ্পাপ ইমাম এবং অভ্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম তথা ইমামে 'আযম। তাঁকেই ইমাম হিসাবে গ্রহণের তাওফীক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দিন!

মহান আল্লাহ যেভাবে বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন- (আল- ইমরান-১০৩) এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে জানিয়েও দিয়েছেন যে- দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, তাদের সাথে রসূল ﷺ'র কোনই সম্পর্ক নেই- (আন'আম- ১৫৯)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে- মুসলমানগণ আল্লাহর সেই আদেশ, নিষেধ ও সতর্কবাণী সব কিছুকে উপেক্ষা করে দলে দলে তথা মাযহাবে মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অখণ্ড দ্বীনে ইসলামকে টুকরো টুকরো করে ফলেছে। যেমন কেউ হানাফী হয়েছে তো কেউ মালেকী হয়েছে, কেউ শাফিঈ হয়েছে তো কেউ আবার হাম্বালী হয়েছে। প্রত্যেকে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আলাদা আলাদা মাযহাব তথা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু, কেন মুসলমানরা এভাবে দ্বীনে ইসলামকে খণ্ড খণ্ড করে দলে দলে

বিভক্ত হল? তারা কি আল্লাহ আদেশ-নিষেধ কোনটাই মানতে চায় না এবং সাবধান বাণীর পরে সাবধান হতে চায় না?

আমার ইলম অনুসারে এ বিভক্তির মূল কারণই হচ্ছে মাযহাব। আর এ মাযহাবের সৃষ্টি ও বিস্তারের পিছনে দুটি কারণ ক্রিয়াশীল রয়েছে। যথা-

১। ভক্তির স্থলে অতি ভক্তি করা বা তাক্বলীদকে বাধ্যতামূলক মনে করা।

২। সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অভাবে কুরআন-হাদীসকে সার্বিকভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে না মানা বদলীয় তথা মাযহাবগত ভাবে মানা। এবং এর স্থায়ী হওয়া ও টিকে থাকার পিছনে আরো তিনটি কারণ ক্রিয়াশীল রয়েছে।

৩। আল্লাহকে ভয় না করে দুনিয়ার স্বার্থে মাতাল হওয়া বা থাকা।

৪। বাপ-দাদার অনুসরণকে হাক্ব মনে করা তথা ছাড়তে না পারা। এবং

৫। মানুষের ভয়ে দ্বীনের সংস্কার কার্য ত্যাগ করে বাত্বিলের সাথে আপোষ করে চলা।

এ পাঁচটি কারণেই মুসলমানগণ বিভিন্ন মাযহাব ও ত্বরীক্বায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যথা কোন মুসলমানই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও সর্তকবাণীকে উপেক্ষা করত না।

অতএব হে মুসলমানগণ! আপনাদের আমাদের যাদের মধ্যে- যে কারণটি বা যে কারণগুলো আছে, তা আল্লাহকে রাযী করার নিমিত্তে ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করি।

আসুন! তাক্বলীদী শিকলকে ছিন্ন করে কুরআন-হাদীসের সরাসরি অনুসরণ করি। আমরা যারা কুরআন-হাদীস পড়তে বা বুঝতে পারি না, তারা সেসব 'আলিমের অনুসরণ করি যারা কুরআন-হাদীস বুঝে সে অনুসারে সরাসরি 'আমাল করেন।

আসুন! আমরা হাক্ব বুঝার, জানার এবং মানার চেষ্টা করি।

মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝা-বুঝি ও রাজনৈতিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ছিল বটে, কিন্তু দ্বীনে ইসলাম অবিভাজ্য ছিল- খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হন নি। এবং মুসলমানগণও একই দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয় নি। কেউ কাউকে কাফির ফাতওয়া দিতেন না, সবাই সবার পিছনে সলাত আদায় করতেন। কিন্তু মাযহাবের সৃষ্টির পরে অবিভাজ্য দ্বীন খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হয় এবং মুসলমানগণ দরে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অতএব আমরা সবাই যদি মাযহাবকে দাফন করে কুনআন-হাদীসের অনুসরণের দিকে ফিরে যাই, তাহলে ইসলামের অখণ্ডতা পুনরায় ফিরে আসবে এবং দলে দলে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে আমরা মুসলমানগণ রেহাই পাব।

অতএত আসুন! আমরা সবাই নিজ নিজ মাযহাব ত্যাগ করে ঐকের মাযহাব তথা রসূল ﷺ'র মাযহাব অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের সরাসরি অনুসরণের মাযহাব গ্রহণ করি। এটাই তো ছিল সাহাবা, তাবেঈন ও মুজতাহেদ ইমামগণের মাযহাব। এক কথায় মাযহাবের সৃষ্টিপূর্ব সকল মুসলমানের মাযহাব ।

অতএব আসুন! ইসলামের ইমামগণের সকলকে আমরা সমভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি এবং তাঁদের কাজকে নির্দিষ্টভাবে নিজের ইমাম স্থির না করি। আমরা এ কাজ করলেই ইনশা-আল্লাহ আবারো অবিভাজ্য দ্বীনে ইসলাম ফিরে পাব যেখানে থাকবে না মাযহাবী বা দলাদলির দ্বন্দ্ব। যদি সে অবিভাজ্য দ্বীন ফিরে নাও পাই তবুও ইনশা-আল্লাহ আমি ও আপনি তাক্বলীদী মাযহাব ত্যাগ করে রসূল ﷺ'র মাযহাব গ্রহণের ফলে আল্লাহ তা'আলার নিকটে ইসলামের অখণ্ডতা ও মুসলমানদের ঐক্যকামী হিসাবে পরিগণিত হব এবং দ্বীনে ইসলামকে খণ্ড খণ্ড করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির অপরাধে শরীক হওয়া থেকে বাঁচতে পারব। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ "তোমরা আমার রজ্জুকে একতাবদ্ধভাবে মুজবুত করে আকঁড়ে ধর" এবং নিষেধ "তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ো না" এর মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। অনুরূপভাবে তাঁর এ সর্তক বাণী "যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে

(হে রসূল ﷺ) তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।" যাদের সম্পর্কে এ আয়াত তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকেও বাঁচতে পারব।

পরিশেষে আল্লার নিকট প্রার্থনা করি- তিনি যেন আমাদের সবাইকে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সতর্ক বাণী মেনে চলার তাওফীক দেন এবং দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দলে দলে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ঐক্য ও অখণ্ডতাকামীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তার নিকটে আরও তাওফীক চাই যেন, তিনি আমাদের সকলকে সঠিক ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন এবং ঈমানী মৃত্যু দান করেন। আমীন সুম্মা আমীন!

রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না হাযাদ্ দুআ ইন্নাকা আন্তাস্ সামীয়ুল 'আলীম।

বিনীত
অনুবাদক

লেখকের প্রতি জাপানবাসীর পত্রই হচ্ছে বইটি লেখার কারণ–

মহান আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। যিনি আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও ঈমান আনার জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কিতাব আল-কুরআনের অর্থসমূহ এবং জিন-ইনসানের সরদার রাসূলের (ﷺ) হাদীসসমূহ বুঝারও তাওফীক দিয়েছেন। তাঁর (নবীর) উপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক যে যাবৎ দিন-রাত বিদ্যমান থাকে। তিনি আমাদের জন্য রাসূলের ছাহাবীগণ (رضي الله عنهم) ও একনিষ্ঠতার সাথে পরিপূর্ণ ও পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে তাঁদের অনুসারীগণের পথে চলাও সহজ করে দিয়েছেন।

অতঃপর স্বীয় সর্বময় শক্তিমান রব্বের করুণার ভিখারী বান্দা, আব্দুল কারীম ও আব্দুর রহমানের পিতা মুহাম্মাদ সুলতান বিন আবী আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আউরুন আল মা'ছূমী আল খুজান্দী আল মাক্কী[২] বলেনঃ (আল্লাহ্ তাঁকে নিজ কিতাব আল কুরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত আল-হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দিন এবং জীবন সন্ধ্যায় উত্তম পরিণতি লাভে ধন্য করুন)। জাপানের দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত টোকিও ও ওসাকা নগরীর মুসলিমগণ তাঁকে (লেখককে) প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ ইসলাম ধর্মের হাক্বীকত কী ? মাযহাব শব্দের অর্থ কী? যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে কি চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব নির্দিষ্টভাবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে? অর্থাৎ তাদেরকে কি মালেকী অথবা হানাফী অথবা শাফেঈ অথবা হাম্বলী হতেই হবে? নাকি হতে হবে না?

---

[২] মূলতঃ তিনি তুর্কীস্তানের বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে তার দেশ যখন রাশিয়া ও চীনের দখলে চলে যায় তখন তিনি মক্কায় চলে আসেন এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই বসবাস করেন। মক্কার দারুল হাদীসের শিক্ষক আল-মাসুমী ছিলেন বিশেষ আলেমে দ্বীন ও দাঈ। তিনি নিয়মিত মাক্কার হারামে দারস দিতেন বিশেষ করে হাজ্জ মওসুমে আগত হাজীগণের সামনে তিনি দারস পেশ করতেন। বিশেষ করে তিনি তুর্কী হাজীদের জন্য তুর্কী ভাষায় দ্বীনী আলোচনা পেশ করতেন। অন্যান্য দেশের হাজীরাও তা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে শুনতেন। তিনি শুধু দ্বীনী আলোচকই ছিলেন না বরং বেশ কিছু রিসালা তিনি সংকলন করে গেছেন যা প্রকাশ পেয়েছে। ১৩৮০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, এবং তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

তার কারণ, যখন জাপানের কতিপয় স্বচ্ছ চিন্তাশীল লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ঈমানী মর্যাদায় মর্যাদাবান হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তখন এক বিরাট মতানৈক্য ও অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তারা যখন টোকিওতে মুসলিম সংস্থার নিকট তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তখন হিন্দুস্তানী একদল মুসলিম বললেন, তাদের উচিত হবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)'র মাযহাব গ্রহণ করা ; কারণ, তিনি উম্মতের আলোকবর্তিকা। ইন্দোনেশিয়ার জাভা শহরের মুসলিমদের একদল বললেন, তাদের শাফিঈ মাযহাব গ্রহণ করা আবশ্যক। জাপানীরা তাদের মুখ থেকে এসব কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হন এবং কাংক্ষিত বিষয়ে (ধর্ম গ্রহণে) দিশেহারা হয়ে পড়েন। এভাবে মাযহাবী কোন্দল তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব হে আমাদের উস্তায, আমরা তো আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা জানি। আল্লাহ চাহে তো আপনার পাণ্ডিত্য এ মাযহাব নামক রোগ ব্যাধির নিরাময়ের কারণ হতে পারে। কাজেই আপনার মত একজন বিদ্যাসাগরের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, মাযহাবের হাক্বীক্বত বা তথ্যটা একটু মেহেরবানী করে বর্ণনা করবেন। যাতে আমরা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি এবং আমাদের বক্ষদেশ প্রশস্ত হয়ে অজ্ঞতা রোগের নিরাময় হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে অফুরন্ত প্রতিদান ও আমাদের পক্ষ হতে উত্তম প্রশংসা। আমরা রাশিয়া থেকে হিজরত করে আসা জনগোষ্ঠী। আপনার ও প্রত্যেক হিদায়াতগামীর উপর সালাম।

মুহাম্মাদ আব্দুল হাই কুরবান আলী
ও মুহসিন জারাক উগলী
টোকিও
মুহাররাম ১৩৫৩ হিজরী

ঈমান ও ইসলামের হাক্বীক্বতের বর্ণনা

আল্লাহ আমাকে যতটুকু জানার তাওফীক্ব দিয়েছেন সেই অনুসারে পরবর্তী কথাগুলো লিখে (জাপানী মুহাজিরদের প্রশ্নের) উত্তর প্রদান করলাম। মহান আল্লাহই সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন সামর্থ্য নেই। সঠিক ও নির্ভুল কাজে তিনিই তাওফীকদাতা।

জেনে রাখুন যে, মূর্খ লোক তো দূরের কথা, ইসলামের অনুসারী অনেক আলেমও এ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এ মাযহাব চতুষ্টয়ের যে কোন একটি মাযহাব মুসলিম ব্যক্তিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এরূপ ধারণা করা নিতান্ত ভুল। বরং তা এর প্রবক্তার মূর্খতা এবং ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। বুখারী ও মুসলিমের এক প্রসিদ্ধ ছহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। সলাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকলে তার হাজ্জ করা– (এ পাঁচটি বিষয়ের নাম হচ্ছে ইসলাম। তিনি (আবারো) জিজ্ঞেস করেন যে, ঈমান কাকে বলে? উত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, (আসমানী) কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম হচ্ছে ঈমান। প্রশ্নকারী (আবারো) জিজ্ঞেস করেন ইহ্সান কাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, কিন্তু যদি তাঁকে দেখার ধারণা অন্তরে সৃষ্টি করতে না পার, তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন–এভাবে ইবাদত করাকেই ইহ্সান বলে।

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে আছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি

http://www.shorolpoth.com

বিষয়ের উপর " আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল–এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সলাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকলে তার হাজ্জ করা।

ইমাম মুসলিম (রহি.) আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলের (ﷺ) নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূল (ﷺ)) তাকে বললেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল–এ কথার সাক্ষ্য দান করবে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। (একথা শুনে) প্রশ্নকারী বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু করব না এবং এর থেকে কোন কিছু কমও করবনা। রাসূল (ﷺ) লোকটির এ কথা শুনে বললেন– মরুবাসী সফলতা (জান্নাত) লাভ করবে যদি সত্য বলে থাকে অর্থাৎ সত্যে পরিণত করে। হাদীসটি ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য ইমামগণও বর্ণনা করেছেন।

হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ হাদীছে হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে, তখনও হজ্জ ফরয হয়নি।

বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসটি আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আনাস) বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম। ইত্যবসরে এক লোক উটে চড়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং উটটিকে মসজিদের পাশে বসিয়ে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যকার কোন্ লোকটির নাম মুহাম্মদ? সে সময় নবী (ﷺ) সহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি বলল, হেলান দিয়ে বসা ঐ শুভ্র বর্ণের লোকটির নাম মুহাম্মদ। অতঃপর লোকটি তাঁকে (নবীকে) লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র?

নবী (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর পুত্র। অতঃপর লোকটি নবী (ﷺ)-কে বলেন, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নে আপনার প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করব–এতে আপনি আমার উপর কোন দুঃখ করবেন না। তখন নবী (ﷺ) বললেন, তোমার মনে যা চায় জিজ্ঞেস কর। লোকটি বললেন, আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সকল মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন? নবী (ﷺ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, আল্লাহর শপথ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন? নবী (ﷺ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন–আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন? নবী (ﷺ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি বললেন, আমি আপনার আনীত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনলাম এবং পিছনে রেখে আসা আমার ক্বাওমের লোকদের জন্য আমি সংবাদ বাহক হলাম। আমার নাম যিমাম ইবনু ছা'লাবাহ। আমি বানু সা'দ ইবনু বাকরের ভাই।

অতএব এটিই হচ্ছে ইসলাম–যা গ্রহণের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যার পূর্ণ বিবরণ দেয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেছেন।

চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে অন্ধ অনুসরণ করা ফরয ওয়াজিব তো দূরের কথা– মুস্তাহাবও নয়।

মাযহাবসমূহ হচ্ছে–কতিপয় (শরঈ) বিষয়ে মনীষীদের নিজস্ব মতামত, চিন্তাভাবনা বা গবেষণা মাত্র। এর অনুসরণ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) কারো উপরে ওয়াজিব করেননি। তার কারণ, এর মধ্যে যেমন কিছু ঠিক আছে, তেমন কিছু বেঠিকও আছে। আর নিরংকুশ সঠিক তো তাই যা রাসূল (ﷺ) হতে সুপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইমামগণ বহু মাসআলাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যখন দেখেছেন যে, সঠিক সিদ্ধান্ত অন্যটি, তখন নিজ মতামত পরিত্যাগ করে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে

প্রত্যাবর্তন করেছেন। অতএব যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ঈমানী মর্যাদায় ধন্য হতে চান, তাদের করণীয় বলতে কেবল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– এ কালেমার সাক্ষ্য দান, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের ছিয়াম পালন করা, এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হাজ্জ করা।

এছাড়া চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব বা অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিবও নয় এবং মুস্তাহাবও নয়। কোন মুসলমানের উপর যে কোন একটি মাযহাব নির্দিষ্টভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা আদৌ আবশ্যকীয় নয়। বরং যে ব্যক্তি সকল মাসয়ালাতে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরে থাকে, সে নির্ঘাত গোঁড়া এবং ভুলকারী ও অন্ধ অনুসারী। সে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের দ্বীন (ধর্ম)কে টুকরা টুকরা করে নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন "

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

অর্থ " নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে বিখণ্ডিত করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, (হে নবী) তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। [সূরা আন'আম- (৬) ঃ ১৫৯]

আল্লাহ (ﷻ) আরো এরশাদ করেন "

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

অর্থ " এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের ধর্মে ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল রয়েছে। [সূরা রূম (৩০) ঃ ৩১-৩২]

অতএব ইসলাম একটি মাত্র ধর্মের নাম। তাতে কোন মাযহাব নেই এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ত্বরীকা ও আদর্শ ছাড়া কোন ত্বরীকাও নেই।

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন ঃ

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ ঃ (হে রাসূল) আপনি বলে দিন " এ আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে সজ্ঞানে আহ্বান করি। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি শির্‌কবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

[সূরা ইউসুফ (১২) ঃ ১০৮]

মাযহাবের (অন্ধ অনুসারীদের) মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতু মাযহাব সমূহকে কেন্দ্র করে বহু পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ (ﷻ) বলেন ঃ

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ "এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়োনা। অন্যথায় তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

[সূরা আনফাল (৮) ঃ ৪৬]

মহান (প্রতিপালক) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং আল-কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একত্রিতভাবে মজবুত করে আঁকড়ে ধর। আর দলে দলে বিভক্ত হয়োনা। [সূরা আলু ইমরান (৩) ঃ ১০৩]

http://www.shorolpoth.com

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস অনুসারে আমল করার উপর

এটিই হচ্ছে সত্য ইসলাম, যার মূল ও ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। সর্ব প্রকার মত পার্থক্যে মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে আসেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে যায় সে মুমিন নয়। যেমন আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন "

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ অতএব আপনার রবের শপথ, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে তারা ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে নিবে এবং আপনার মীমাংসা সম্পর্কে নিজেদের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা পোষণ করবে না এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তা কবূল করে নিবে। [সূরা নিসা (৪) ঃ ৬৫]

কোন ইমামই বলেননি যে, তোমরা আমার মতের অনুসরণ কর। বরং তারা এর বিপরীতে বলেছেন যে, তোমরা সেখান থেকে (শরীয়ত) গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। তদুপরি এ মাযহাবসমূহের সাথে যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালের বহু মনীষীর বহু চিন্তা চেতনা। যার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে এবং এমন বহু কাল্পনিক মাসয়ালা রয়েছে যা ঐ সব ইমামগণ যদি দেখতেন যাদের মাযহাবের নাম দিয়ে এগুলো চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তারা ঐ সকল মাসয়ালা ও তার আবিস্কারকদের থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করতেন।

প্রত্যেক পূর্বসূরী ইমাম যেমন ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, সুফয়ান ছাওরী, সুফয়ান ইবনু ওয়াইনা, হাসান বাসরী, ক্বাযী আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী, আব্দুর রহমান আল আওযায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইমাম বুখারী, মুসলিম (রহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন) প্রমুখ ইমামগণ–যাদের থেকে ইলমে দ্বীন আহরণ করা হয়, তারা সবাই কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন এবং মানুষকেও তা গ্রহণ করার ও তদনুযায়ী আমল করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। তারা সবাই বিদ'আতকে এবং নিষ্পাপ (রাসূল) ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির (অন্ধ অনুসরণ)-কে ভয় করে চলতেন। আর একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যত বড় ইমামই হোকনা কেন তিনি কিন্তু নিষ্পাপ নন। অতএব তার (অনিষ্পাপ ব্যক্তির) সে সব কথা মানাই যাবে যা কুরআন হাদীসের অনুকূলে হবে আর যা কুরআন হাদীসের প্রতিকূলে হবে তা পরিত্যাজ্য। যেমন ইমাম মালিক (রহ.) রাসূল (ﷺ)-এর ক্ববরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, এই ক্ববরবাসীর কথা ছাড়া অন্য যে কোন মানুষের (কিছু) কথা গ্রহণযোগ্য হবে আর (কিছু) পরিত্যাজ্য। এ নীতির উপর ইমাম চতুষ্টয় ও তত্ত্বান্বেষী অন্যান্য ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভেজালপূর্ণ তাক্বলীদ থেকে (অন্যদেরকে) সতর্ক করেছেন। তার কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বহু স্থানে এহেন ভেজালপূর্ণ তাক্বলীদের নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ কাফিররাই একমাত্র তাদের ধর্মীয় বিদ্বান, সন্ন্যাসী, পীর-মুরুব্বী ও পিতৃ পুরুষের তাক্বলীদের মাধ্যমেই কুফুরী করেছে।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ সহ অন্যান্য ইমামগণ থেকে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে তাঁরা বলেছেন, আমরা যে সব দলীল থেকে ফাতওয়া প্রদান করেছি তা যে ব্যক্তি জানেনা, তার জন্য আমাদের কোন কথা দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা বৈধ নয় এবং তদনুযায়ী আমল করাও বৈধ নয়। তাঁরা সবাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন যে, সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে এটাই আমার মাযহাব। তাঁরা প্রত্যেকে এও বলে গেছেন যে, আমাদের কথাগুলোকে কুরআন-হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখ। যদি মিলে যায়, তাহলে তা গ্রহণ কর আর যা মিলেনা তা প্রত্যাখ্যান কর এবং দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মার। এ সব হল জগদ্বিখ্যাত ইমামগণের কথা। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ঠ করুন।

কিন্তু পরবর্তী যুগের মুকাল্লিদদের জন্য আক্ষেপ! সহস্র আক্ষেপ! আরো পরিতাপ সেই সব গ্রন্থ প্রণেতাদের জন্য যারা লিখে লিখে বহু খাতা কালো করে ফেলেছেন। অথচ মানুষেরা তাঁদেরকে গবেষক নিষ্পাপ আলেম মনে করে রেখেছে। তাঁরাই তো মানুষকে চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজনের নামে প্রচলিত মাযহাব ও তার অন্ধ অনুসরণ করতে বাধ্য করেছেন। আর একটি মাযহাব নির্দিষ্টভাবে গ্রহণের পর অন্য কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের কোন কথা গ্রহণ এবং তদনুযায়ী আমল করা হারামও করে দিয়েছেন। তাদের এ আচরণ দেখে মনে হয় যে, তারা মুকাল্লাদ (অন্ধভাবে অনুসৃত) ইমামকে যেন মান্যবর প্রেরিত নাবী বানিয়ে নিয়েছেন। হায় আফসোস! তারা ইমামের নাম ছাড়া আর কিছুই জানেনা। অথচ পরবর্তী যুগের কিছু লোক বহু মাসআলা বানিয়ে এবং বহু মাযহাব সৃষ্টি করে ইমামের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। ফলে তৎপরবর্তী যুগের লোকের ধারণা হচ্ছে যে–এটা আমাদের ইমামের কথা বা মাযহাব। কিন্তু বাস্তবে তা ইমাম সাহেবের কথা ও সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং তার সাথে ইমাম সাহেবের কোন সম্পর্কই নেই। যেমন পরবর্তীকালের অনেক হানাফী আলিম ছালাতের তাশাহ্হুদে তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে "ইয়াদুল্লাহ" (আল্লাহর হাত)-এর অর্থ করেন আল্লাহর ক্ষমতা (আল্লাহর কুদরতি হাত) এবং আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত নন বরং সকল স্থানে বিরাজমান, এ রকম ধারণা পোষণ করে থাকেন।

মাযহাব সৃষ্টি ও এর অনুরূপ কার্যক্রমের জন্যই মুসলমানদের শক্তিতে ফাটল ধরেছে ; তাদের জামা'আত ও জমঈয়ত দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তালির উপর ছিদ্র সুপ্রশস্ত আকার ধারণ করেছে, বিশ্ব জাহান মুনাফেক্বী ও শত্রুতায় ভরে গেছে। ফলে লোকেরা পরস্পরকে বিদ'আতী বলছে এবং প্রত্যেক দলই তার বিরোধী দলকে সামান্য কারণে পথভ্রষ্ট বলছে। এমনকি পরস্পর পরস্পরকে কাফির বলতেও দ্বিধা করছেনা। কখনো বা একে অপরকে হত্যা করছে। এভাবেই বিশ্ব নেতা মুহাম্মাদুর

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে– তিনি (ﷺ) বলেছেন ঃ

«تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

তিনি (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। সবগুলো দলই জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি দল ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সে দলের পরিচয় কী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তারা সেই দল যারা আমার ও সহাবীগণের পথ অনুসরণ করে চলবে।[৩]

পরবর্তী যুগের লোকেরা (দ্বীনের ভিতর) পরিবর্তন সাধন করে মানুষকে নির্দিষ্ট তাক্বলীদ করতে বাধ্য করেছে। ফলে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ (ﷻ)র পশথ করে বলছি যে, নিশ্চয় মুসলমানেরা যখন খাঁটি ও পূর্ণ মুমিন ছিলেন, তখন তারা ছিলেন সাহায্য প্রাপ্ত, দেশ বিজেতা, দ্বীনের পতাকা সমুন্নতকারী। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের মধ্যে। কিন্তু যখন মুসলমানেরা বিশ্বনিয়ন্তার আদেশসমূহ বদলে ফেলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ামতের বদলে শাস্তি দেন, কেড়ে নেন তাদের রাজত্ব, মুছে ফেলেন তাদের খিলাফত। কুরআনের বহু আয়াত এর প্রমাণ বহন করে।

পরবর্তীতে বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশেষ মাযহাবের অনুসরণপূর্বক মাযহাবী হয়ে যাওয়া এবং তজ্জন্য বাতিলের আশ্রয় নিয়ে হলেও পক্ষপাতিত্ব করা। এই মাযহাবসমূহ শরীয়তের মধ্যে একটি বিদআত। যা রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের তিন শত বছর পর

[৩] কিতাব الإيمان عن رسول الله , বাব ما جاء في افتراق هذه الأمة হাদীস নং ২৬৪১। আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।

আবিষ্কৃত হয়েছে–এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর প্রত্যেকটি বিদআত যা নেকীর আশায় দ্বীন হিসেবে পালন করা হয় তাই ভ্রষ্টতা। বিগত যুগের সৎকর্মশীল পুরুষগণ কুরআন হাদীসের নির্দেশিত পথ ও ইজমায়ে উম্মতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন, তাঁদের প্রতি খুশী হয়ে তাদেরকে তুষ্ট করুন। আমাদেরকে তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করুন এবং তাঁদের দলভুক্ত করে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করুন। কিন্তু মাযহাব নামক বিদআতের যখন থেকে বিস্তার শুরু হয় একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলাবলি, এমনকি উদাহরণ স্বরূপ, ফাতাওয়া দেওয়া হয় যে, শাফেঈ ইমামের পিছনে হানাফীদের সলাত হবেনা। যদিও আপনারা বলে থাকেন যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণ সকলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কার্যাদি তাদের এ উক্তির বিরোধিতা করে এবং এর অসারতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে তাদেরকে মিথ্যুকও প্রমাণ করছে। কারণ, এ বিদআতসমূহ (মাযহাব)-কে কেন্দ্র করে আল মাসজিদুল হারামে (কাবা শরীফে) চার মুসল্লার সৃষ্টি হয়। (একই কাবা গৃহে) একই সলাতে একাধিক জামাত (চার মাযহাবের চার জামাত) ক্বায়েম হয়। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী নিজ মাযহাবের জামাতে সলাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইবলীস এই বিদআতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। কাজেই আল্লাহর কাছে আমরা এ রকম দলবিভক্তি থেকে আশ্রয় চাই।

ক্ববরে মানুষকে মাযহাব বা ত্বরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে কি?

হে বিবেকবান ন্যায় পরায়ণ মুসলিম!

মহান আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি– আচ্ছা বলুনতো মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন ক্ববরে কিংবা

বিচার দিবসে তাকে কি প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি কেন ওমুকের মাযহাব গ্রহণ করনি? বা কেন ওমুকের ত্বরীকায় প্রবেশ করনি? আল্লাহর শপথ করে বলছি–আদৌ আপনাকে এ প্রশ্ন করা হবে না। বরং প্রশ্ন করা হবে–কেন তুমি ওমুকের মাযহাবকে আঁকড়ে ধরেছিলে? অথবা কেন তুমি ওমুকের তরীকা মতে চলতে? তার কারণ নিঃসন্দেহে এতে (মাযহাব বা তরীকা গ্রহণে) আল্লাহর স্থলে ধর্মীয় বিদ্বান ও দরবেশদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপরন্তু এটি দ্বীনের ভিতরে সৃষ্ট বিদআত। আর প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রান্তি।

হে মানুষ, আপনাকে তো তাই জিজ্ঞেস করা হবে যা আল্লাহ আপনার উপর ওয়াজিব করেছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। ঈমানের দাবী কোন নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ বা ওমুকের তরীকা মতে চলা নয়। কিন্তু হ্যাঁ, ঈমানের দাবী হচ্ছে, আপনি যা জানেন না, তা কুরআন ও হাদীসের পণ্ডিত আহলুয্ যিক্‌রদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন এবং যে সকল বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় তার ফায়সালাও কুরআন-হাদীস থেকে গ্রহণ করবেন। এরই নাম দ্বীন ইসলাম। যা নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রেরিত হয়েছেন।

অতএব হে মুসলিম! আপনি দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন! আর তা হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করা। এ কথার উপরেই অতীত মুসলিম মনীষী ও নেককার ইমামগণ ঐকমত্য প্রকাশ করে গেছেন। এরই ভিতর আপনার মুক্তি ও সৌভাগ্য নিহিত আছে।

অতএব তাওহীদবাদী মুসলিম হোন, কেবল আল্লাহর ইবাদত করুন, তাঁরই প্রত্যাশী হোন, তাঁকেই শুধু ভয় করুন আর নিজেকে প্রত্যেক মুসলিমের ভাই বানিয়ে নিন। সুতরাং ভালবাসুন তাদের জন্য তাই, যা নিজের জন্য ভালবাসেন। (দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলে) ইমাম তিরমিযীর সুনানে বর্ণিত ইরবায ইবনে সারিয়ার নিম্ন হাদীসটিই যথেষ্ট হবে।

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

তিনি (ইরবায) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের ছালাত শেষে নিতান্ত অর্থবহ এক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শুনে চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। জনৈক ছাহাবী বলেই ফেলেন, এটাতো বিদায়ী বক্তব্য মনে হচ্ছে। অতএব আপনি আমাদেরকে কী ওসিয়াত করছেন? তিনি (রাসূল) বললেন, আমি তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং হাবশী (কাফ্রী) গোলামও যদি তোমাদের আমীর হয় তবুও তার কথা শোনার ও আনুগত্য করার। তার কারণ, তোমাদের যারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবন পাবে, তারা বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা সাবধান থাকবে শরীয়তের ভিতর নবোদ্ভাবিত কাজকর্ম থেকে যা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু না। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময় পেয়ে যাবে তার অবশ্য কতর্ব্য হবে আমার সুন্নাত (ত্বরীকা) এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে চোয়ালের দন্ত দ্বারা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।[৪]

এ হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা সুনানে আবী দাউদেও রয়েছে।

অতএব ঘটনা যখন এরকম, তখন জড়তাচ্ছন্ন অন্ধ অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে সাবধান থাকতে হবে। তার কারণ, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসআলাতে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করবে, সে অনেক

---

[৪] সুনানুত তিরমিযী, কিতাব العلم عن رسول الله, বাব مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ, হাদীস নং ২৬৭৬, মুসনাদ আহমাদ ১৬৬৯২, শু'আইব অরনাউত এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সময় বহু সহীহ হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দিয়ে তার বিরোধিতা করবে– এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর এরূপ কাজ নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। আর একারণেই বহু সংখ্যক হানাফী ও অন্যান্য মুহাক্কিক আলেমগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ আবশ্যক নয়। বরং নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরা বিষয়টি একেবারে দুর্বল। এ কথা লিখিত আছে কামাল ইবনুল হুমামের "আততাহরীর" নামক গ্রন্থে এবং ইবনু আবেদীন আশ্‌শামীর "আওয়ায়েলে রাদ্দুল মুহতার" নামক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাগুলোতে।

নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরার আবশ্যকীয়তার মূল ভিত্তিই হচ্ছে রাজনীতি

অধম বান্দাহ আলমা'সূমী বলছি, নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হওয়া আবশ্যক কথাটি রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ, যুগের প্রগতি সাধন, এবং ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির উপর যে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিশীল, তা ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানেন। অচিরেই বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা পরবর্তীতে প্রয়াস পাব। অথচ ওয়াজিব হচ্ছে শুধু হক্ব চিনে সে অনুযায়ী আমল করা।

জেনে রাখুন, যে হক্ব বা খাঁটি মাযহাব এর অনুগামী ও অনুসারী হওয়া ওয়াজিব, তা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাযহাব। আর তিনিই হচ্ছেন, ইমামে আযম যাঁর অনুসরণ অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁর পরে তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার হুকুম আমাদের দেয়া হয়নি। যেহেতু আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন "

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

অর্থ ঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন– তা থেকে বিরত থাক।" [সূরা হাশর ৭]

রাসূল (ﷺ) বলেন–

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ»

((তোমরা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত (ত্বরীকা)কে আঁকড়ে ধর।))[5]

ইমাম আবু হানীফা বা মালেক সহ ইমামগণের কেউই একথা বলেননি যে তোমরা আমার কথাকে আঁকড়ে ধর বা আমার মাযহাব তোমরা গ্রহণ কর। এমনকি আবু বাকরও বলেননি এবং ওমারও বলেননি (রাঃ)। বরং তাঁরা সকলেই অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এটাই যদি হয় আসল কথা তাহলে এ মাযহাবগুলো কোত্থেকে এসেছে? এবং কেনই বা বিস্তার লাভ করল আর মুসলমানদের উপর কেনই বা তা চাপিয়ে দেয়া হল? অতএব একটু ভেবে দেখুন ও গভীরভাবে চিন্তা করুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, এর বিস্তার উত্তম যুগসমূহের পরেই ঘটেছে (আগে নয়)। এবং অত্যাচারী নেতা, মূর্খ শাসক এবং বিভ্রান্তকারী আলেমরাই এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

"আল-ইনসাফ" নামক পুস্তিকায় দেহলভীর তথ্য অনুযায়ী মাযহাব একটি বিদ'আত

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী স্বীয় "আল-ইনসাফ" গ্রন্থে বলেন ঃ জেনে রাখুন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের মুসলমানরা মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং সে সময় কোন মাযহাবও ছিল না। কাজেই পূর্বসূরী মুসলমানগণ মাযহাব কী জিনিস তা চিনতেন না। বরং একমাত্র শরীয়ত প্রবক্তা (রাসূল)-এর অন্ধ অনুসরণ

[5] সুনান ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ বাব اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, হাদীস নং ৪২। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

করতেন। কোন ব্যক্তির পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির কথা সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সহাবী, তাবেঈন ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী সালাফে ছালেহীনের ইজমা (ঐকমত্য) সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা কিংবা মালিক বা শাফেঈ কিংবা আহমাদ বা অন্য কারো সকল কথাই কুরআন হাদীসের প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করেন তিনি ইজমায়ে উম্মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজে প্রবৃত্ত হবেন এবং মুমিনদের পথের বাইরে অন্য কিছুর অনুসারী বিবেচিত হবেন। এমন অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আর এ জন্যই এ সমস্ত ফেক্বাহবিদগণ তাদের ও অন্যান্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করে গেছেন। সুতরাং যারা (তাদের কথা না মেনে) তাদের তাক্বলীদ করেছে, তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। উপরোক্ত কথাগুলোর ন্যায় উক্তি করেছেন ইমাম ইযয ইবনু আবদিস সালাম স্বীয় গ্রন্থ "ক্বাওয়ায়েদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম" এবং শায়খ ছালেহ আলফুলানী স্বীয় গ্রন্থ "ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবসার" গ্রন্থে।

অতএব এ সকল প্রচলিত বিদ'আতী মাযহাবসমূহের অন্ধ অনুসারী গোঁড়া সমর্থকদের কাণ্ডকীর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তার কারণ এদেরই কোন লোককে দেখা গেছে যে, মাযহাবের নামে এমন কিছুর সে অনুসরণ করে চলেছে যার দলীলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইমামকে প্রেরিত নবীর মত মনে করছে। একেই তো হক্ব থেকে সরে পড়া এবং সঠিকতা থেকে দূরে চলে যাওয়া বলে। আমরা নিজেরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং পরীক্ষা করে জেনেছি যে, অন্ধ অনুসারীরা তাদের ইমামকে ভুলের উর্ধে মনে করে। তিনি (ইমাম) যা বলেন তাই ঠিক মনে করে। তারা অন্তরে এ কথাই পোষণ করে যে, তার (ইমামের) অন্ধ অনুসরণ তাক্বলীদ বর্জন করা যাবে না যদিও তা দলীল (কুরআন হাদীস) বিরোধী হয়। আর এখানেই সেই হাদীসের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে– যা ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যরা আদী বিন হাতিমের বরাতে বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

إنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـــرأ ﴿ اتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ (فتلك عبادتهم لهم)

তিনি (আদী) বলেন– "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিম্ন আয়াতাংশ পড়তে শুনি–

﴿ اتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ " তারা (ইয়াহুদী খ্রীষ্টানরা) নিজেদের ধর্মীয় আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর স্থলে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা তাওবাহ্ ৩১]

আমি তখন বললাম হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো তাদের (পাদ্রী দরবেশদের) ইবাদত করত না। রাসূল (ﷺ) বলেন– নিশ্চয় তারা তাদের জন্য কোন কিছুকে হালাল করলে হালাল জানত এবং হারাম করলে হারাম জানত।[৬] আর এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত করা।[৭]

রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষাবলম্বনকারী গোঁড়া ব্যক্তি হচ্ছে পথভ্রষ্ট, মূর্খ

হে মুসলমানগণ! কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হওয়ার কারণে যদি নিষ্পাপ রাসূলের (ﷺ) বাণীকে বাদ দিয়ে মাননীয় ইমামের কথা ও মাযহাবের অনুসরণ করি, তাহলে বলুন তো আমরাই কি সবচাইতে বড় যালিম হবনা? যেদিন বিশ্বপতির দরবারে হিসাব দেয়ার জন্য মানুষ দণ্ডায়মান হবে সেদিন আমরা কী ওযর পেশ করব? সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির পক্ষপাতিত্বে গোঁড়ামি করে

[6] তিরমিযী কিতাব تفسير القرآن عن رسول الله, বাব ومن سورة التوبة, হাদীস নং ৩০৯৫।
[7] বাইহাকী কুবরা ১০ম খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৩৬।

এবং তাঁর সকল কথাকে নির্ভুল জেনে অন্যান্য সকল ইমামকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁরই অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করে, সে পথভ্রষ্ট মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার কাফির হয়ে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে তার কাছ থেকে তাওবার স্বীকৃতি নিতে হবে। সুতরাং তার তাওবা করাটাই হবে উত্তম কাজ। অন্যথা তাকে হত্যা করা হবে। তার কারণ কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার দৃঢ় ধারণা পোষণ করলে উক্ত ইমামকে নবী (ﷺ)-এর স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হয়। আর এটাই হচ্ছে কুফরী। তবে সর্বোচ্চ এ কথা বলা যেতে পারে যে, অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি যদি ইমাম যায়েদ বা ইমাম আমর এভাবে কোন ইমামকে নির্দিষ্ট না করে যে কোন ইমামের তাক্বলীদ করে তাহলে তা বৈধ হবে বা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামগণের সকলকে সমানভাবে ভালবাসেন এবং সুন্নাত (হাদীস) সমর্থিত বিষয়ে তাদের প্রত্যেকেরই অনুসরণ করেন, তাহলে তাকে এক্ষেত্রে একজন সৎকর্মশীল বলা হবে। আর যে ব্যক্তি তাবেঈর নিম্নস্তরের কোন নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্ব করে, সে তো রাফেযী, নাসেবী ও খারেজীদের মত সকল ছাহাবীকে বাদ দিয়ে শুধু একজন ছাহাবীর অন্ধভাবে পক্ষ অবলম্বন করল। আর এসবই হচ্ছে বিদ'আতী ও মন পূজারীদের পন্থা; যাদের নিন্দাবাদ ও হক্ব থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহ.) স্বীয় মিসরী ফাতওয়ায় উল্লেখ করেন যে, কোন ব্যক্তি উদাহরণ স্বরূপ আবূ হানীফা বা মালিক বা শাফেঈ বা আহমাদের (রহ.) অনুসারী হবার পরও যদি কোন মাসয়ালাতে দলীলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় অন্যের মাযহাবের অনুসরণ করে, তাহলে সেটাই হবে উত্তম। এবং দ্বিমত ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, তার দ্বীনদারী ও ন্যায়পরায়নতায় কোন দোষ বর্তমান নেই। বরং হক্ব বিচার করলে নবী (ﷺ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বন করা অপেক্ষা এটাই হবে উত্তম এবং আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর নিকট অধিক প্রিয় বা পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি কোন

ব্যক্তি আবূ হানীফার (রহ.) অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বন করে এবং ধারণা করে যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার কথা নির্ভুল ও অনুসরণযোগ্য এবং অন্য ইমামগণের কথা তাঁর কথার বিপরীত হওয়ায় তা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ আচরণকারী ব্যক্তি অবশ্যই মূর্খ ; বরং কাফির হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক।

"ইক্বনা" ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট মাযহাব আবশ্যিকভাবে গ্রহণ ও এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে যে, এটা ঠিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বানগণের মতে নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব নয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা করে কারো অনুসরণও করা যাবে না। কারণ সর্বাবস্থাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য করাই মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে। "আলক্বায়া ফীল ইনসাফ" গ্রন্থে শায়খ তাক্বিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব বলে, তাকে তাওবাহ করানো হবে। (তাওবাহ করলে তো প্রাণে বাঁচল) অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কারণ কোন কিছু ওয়াজিব করা হচ্ছে কেবল আল্লাহর কাজ, যা শরীয়ত হিসেবে তিনি বান্দাদের পালন করতে নির্দেশ দেন। অতএব মানুষ কোন কিছু ওয়াজিব করলে আল্লাহর সাথে শরীয়তের বিধান প্রণয়নে শরীক স্থাপন করা হয়।

ইবনুল হুমামের তথ্য অনুসারে নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ অনাবশ্যক

হানাফী উছূলে ফিক্বহের উপর রচিত আত্ তাহরীরু ওয়াত্তাক্বরীর গ্রন্থে কামাল ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেন যে, নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরা আবশ্যক নয়, এটাই বিশুদ্ধ মত। কারণ (শরীয়তে) মাযহাব আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য। যেহেতু ওয়াজিব তো কেবল তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ওয়াজিব করেছেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) কোন মানুষের উপর কোন ইমামের মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব করেননি যে, ধর্মীয় সকল কাজে সে কেবলমাত্র তাঁকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে যাবে।

নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ আবশ্যক এ ধরনের কোন কথা স্বর্ণযুগসমূহে (ইসলামের প্রথম তিন যুগে) ছিল না। অথচ অধিকাংশ মুকাল্লিদরা দাবী করছে যে, আমি হানাফী, আমি শাফেঈ। এদিকে ইমামের ত্বরীকা সম্পর্কে তার কোনই জ্ঞান নেই। অতএব সে শুধু দাবীর মাধ্যমে হানাফী, শাফেঈ হতে পারেনা। যেমন কোন ব্যক্তি ফক্বীহ বা লেখক না হয়েই যদি বলে যে, আমি ফক্বীহ বা লেখক তাহলে সে যেমন ফক্বীহ বা লেখক হতে পারে না, তেমনি কোন ব্যক্তি তার ইমামের চরিত্র থেকে বহু দূরে অবস্থান করে শুধু দাবীর মাধ্যমে তার অনুসারী হতে পারে না। অতএব কী করে তার হানাফী, শাফেঈ হবার নিছক দাবী ও অর্থহীন উক্তি সঠিক হতে পারে? নিজেই একটু ভেবে দেখুন।

"ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবসার" গ্রন্থে তিনি মুকাল্লিদ ও সাধারণ অনুসারীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুকাল্লিদ কখনো আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) বিধান কী তা জিজ্ঞেস করে জানতে চায় না বরং তার ইমামের মাযহাবে কী বিধান আছে সেটা সে জানতে চায়। পক্ষান্তরে অনুসারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) বিধান জানতে চায়, অন্য কোন মত বা মাযহাবে কী আছে, তা সে জানতে চায় না। যদি সে অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে বিষয়ে পূর্বে যে আলিমকে জিজ্ঞেস করেছিল তাকেই জিজ্ঞেস করে না বরং যে কোন আলেমের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর কাছে সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। পূর্বের আলিমের মতানুসারে সে প্রভুর ইবাদত করতে চায় না। তার অন্ধ অনুসরণ ও সমর্থন করেনা। বরং যদি জানতে পারে যে, তার দেয়া ফাতওয়া কুরআন অথবা সুন্নাহর বিপরীত হয়েছে তাহলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এটাই হচ্ছে পরবর্তীযুগের মুকাল্লিদগণের তাক্বলীদ এবং স্বর্ণযুগের নেককার লোকদের ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য।

শরীয়তের পরিভাষায় তাক্বলীদের অর্থ– দলীল বিহীন কোন কথা মেনে নেয়া। শরীয়তে এটি নিষিদ্ধ। আর ইত্তেবা অর্থ দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত বিধান মেনে নেয়া। আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে তাক্বলীদ মোটেই ঠিক নয়। পক্ষান্তরে ইত্তেবা আবশ্যক। মুফতীর ফাতওয়ায় ভুলের সম্ভাবনা

থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের জন্য সে ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা বিধি সম্মত, বরং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব বলা হয়। নবীর (ﷺ) হাদীসের উপরে আমল করা তাহলে কেন তার জন্য বিধি সম্মত হবেনা? এখন যদি বলা হয় যে, ওমুক (ইমাম) যে হাদীসের উপর আমল করেন নি, আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সেই হাদীসগুলো ছহীহ হলেও তার উপর আমল করা জায়েয হবে না। তাহলে দেখা যায় যে, হাদীসের উপর আমল হবার জন্য তাদের (ইমামদের) সমর্থনই একান্ত জরুরী শর্ত। অথচ এ ধরনের কথা চূড়ান্ত পর্যায়ের বাত্বেলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর নাবী (ﷺ)-কেই মানুষের জন্য দলীল বানিয়েছেন, অন্য কোন নির্দিষ্ট একক ব্যক্তিকে নয়। হাদীস বুঝে যদি কোন ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করেন বা ফাতওয়া দেন– তাহলে এতে ভুলের সম্ভাবনা আছে– এ কথা মেনে নেয়া যায় না। তবে সে ব্যক্তির যদি সে বিষয়ে যোগ্যতা না থাকে, তাহলে তার আল্লাহর নিম্ন বাণীটির উপর আমল করা ফরয।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন ঃ

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

অর্থ ঃ যদি তোমরা না জানো, তাহলে আহলুয যিকর (কুরআন হাদীসের পণ্ডিত ব্যক্তিদের)-কে জিজ্ঞেস কর।" [সূরা নাহাল ৪৩]

মুফতীর বা তার উস্তাদের –তিনি যতই উপর স্তরের হোন না কেন– কথার উপর যদি ফাতওয়া প্রার্থীর নির্ভর করা জায়েয হয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক রাসূলের (ﷺ) বর্ণিত হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা তার জন্য (অধিক) জায়েয ও উত্তম হবে। এখন যদি বলা হয় যে, সে হাদীস বুঝে না, তাহলে বলতে হবে সেতো মুফতীর ফাতাওয়াও বুঝে না। অতএব সে ফতওয়ার অর্থ বুঝে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে। অনুরূপভাবে হাদীসবেত্তাদের থেকে হাদীসের অর্থও তো জেনে নিলে হয়। দলীলের ময়দানে তাদের নিকটেও তো ক্বিয়াস (অনুমান) ও ইজতেহাদের (গবেষণার) উপর স্থান আছে হাদীসের এবং রিওয়ায়াতের উপর আমল করা অপেক্ষা হাদীসের উপর আমল

করাই হচ্ছে উত্তম। (তারপরও কেন যে তারা এমনটি করে থাকেন, তা আমার বুঝে আসেনা)

"আল বাহরুর রায়েক্ব" গ্রন্থে আল্লামা ইবনু নাজীম বলেন যে, ক্বিয়াসের (অনুমানের) উপর আমল করা হতে সুস্পষ্ট হাদীসের উপর আমলা করা উত্তম। হাদীস থেকে প্রকাশমান অর্থের উপর আমল করা ওয়াজিব।

মোট কথা, দ্বীনের স্বার্থে সহজ সরল বুঝের অধিকারী ব্যক্তি হাদীস থেকে যা বুঝেন সে অনুযায়ী যদি তিনি আমল করেন তাহলে এটাই হবে সর্বজন গৃহীত মাযহাব। আবূ হানীফা (রহ.) ফতওয়া দেয়ার সময় বলতেন, আমাদের 'ইলম (বিদ্যা) অনুসারে আমরা ফাতওয়া দিলাম। এখন কেউ যদি এর চেয়েও সুস্পষ্ট কিছু পায়, তাহলে সেটাই নির্ভুল হবার বেশী হক্বদার। 'তানবীহু মুগতাররীন' গ্রন্থে শা'রানী এধরনের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন যে, এ উম্মতের কোন ব্যক্তির উপর হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং প্রত্যেক মানুষের উপর নিজে আলেম না হলে, আহলুয যিকরদের কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া ওয়াজিব। ইমাম চতুষ্টয় আহলুয্ যিকরদের অন্যতম। আর এ জন্যই কথিত আছে, যে ব্যক্তি কোন আলেমের (তাক্বলীদ নয়) অনুসরণ করে, সে আল্লাহর সাথে সহীহ সালামতে সাক্ষাত করবে[৮] এবং প্রত্যেক মুকাল্লাফ (বয়স্ক বুদ্ধিমান মুসলিম) ব্যক্তিকে নবী সরদার মুহাম্মদের (ﷺ) অনুসরণ করার হুকুম করা হয়েছে।

অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য একমাত্র ইমাম নবী (ﷺ)

"শারহু সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম" নামক গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল হক্ব দেহলভী বলেন– বাস্তবে কেউ যদি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ইমাম হয়ে

---

[৮] লেখক বলেন– একথাটি গায়ের মুকাল্লেদ অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে– এ শর্তে যে, অনুসৃত আলেমটিকেও গায়র মুকাল্লিদ হতে হবে। এবং শ্রমিকের যেভাবে বেতন ত্বলবের হক্ব রয়েছে, ঠিক সেভাবে অনুসারী ব্যক্তিরও মুফতীর নিকট দলীল ত্বলবের হক থাকবে।

থাকেন, তাহলে তিনি হবেন মুহাম্মদ (ﷺ)। অতএব তিনি ভিন্ন অন্যের অনুসরণ করতে হবে–এটা বুঝে আসেনা। আর এটাই হচ্ছে নেককার পূর্বপুরুষদের ত্বরীক্বা। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করেন।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, মুসলমানদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ মর্মে যে, যার নিকট রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত প্রকাশ পায়, কারো কথার কারণে সেই সুন্নাত পরিত্যাগ করা তার জন্য হালাল হবে না।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পদাংক অনুসরণ করে এবং তাঁর আদেশ ও আমল অনুসারে আমল করে তাঁরাই হচ্ছে হক্বের অনুসারী। আর যদি তাঁর আদেশ ও আমল বিভিন্ন রকমের হয়, সেক্ষেত্রে কখনো এ আদেশ ও আমল অনুযায়ী এবং কখনো সেই আদেশ ও আমল অনুযায়ী আমল করে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন "

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থ ঃ " (হে নবী) আপনি বলে দিন– যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন ......।" [সূরা আলে ইমরান–৩১]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন–

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۟

অর্থ ঃ "এবং রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা (দ্বীনের শিক্ষা হতে) দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তোমাদেরকে যা (করতে) নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" [সূরা হাশর ৭]

এ মর্মে উক্ত আয়াত দু'টি ছাড়া আরো বহু আয়াত আছে। তারা আল্লাহর এ বাণীগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে চায়।

দলাদলি ও মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে মাযহাব সমূহের অনুসরণের ফলে

রসূল (ﷺ) থেকে যখন কোন বিষয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায় এবং কোন্‌টি পূর্বের এবং কোন্‌টি পরের তা জানা যায় না অর্থাৎ বর্ণনার তারিখ অজ্ঞাত থাকে তখন সবগুলো বর্ণনার উপর আমল করাই হবে আপনার কর্তব্য (যদি সবগুলোই সহীহ হয়)। কখনো এ বর্ণনানুসারে কখনো ঐ বর্ণনানুসারে আমল করবেন। ফলে রাসূলের (ﷺ) কৃত আমল সমূহের সবগুলোর উপরে আপনার আমল হয়ে যাবে এবং পুরোপুরিভাবে আপনিও রাসূলের (ﷺ) অনুসারী হয়ে যাবেন। আর যদি আপনি কোন এক প্রকারের বর্ণনা গ্রহণ করে অন্যগুলোকে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনার উপর বিরাট বিপদ (আযাব) নেমে আসার শংকা করা যায়। হাদীসী আমলকে উৎখাত করার চেষ্টায় আপনি যদি কারণ বর্ণনা শুরু করে দেন, তাহলে আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হক্ব থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন যে, আপনি তা টেরই করতে পারবেন না। রাসূল (ﷺ)-এর সুপ্রমাণিত হাদীসকে অস্বীকার করা একজন মুসলিমের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? অথচ রাসূল (ﷺ) মনগড়া কোন কথাই বলেন না। বরং তাঁর মুখ নিঃসৃত সকল কথাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী মাত্র।

মানুষ যখন কিছু হাদীস গ্রহণ ও কিছু হাদীস বর্জন করার ফিতনায় নিপতিত হয়, তখনই মুসলিম জাতিকে দলে দলে বিভক্ত করে দিতে এ মাযহাবসমূহের আবির্ভাব ঘটে। মানুষেরা তখন বলতে শুরু করে – এটা আমাদের নিকটে এবং এটা তোমাদের নিকটে, আমাদের কিতাবসমূহ এবং তোমাদের কিতাবসমূহ ; আমাদের মাযহাব এবং তোমাদের মাযহাব; অনুরূপভাবে আমাদের ইমাম এবং তোমাদের ইমাম। আর এরই সূত্র ধরে মুসলমিগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক ঘৃণা, দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান, হিংসা ও অহংকার করার অভ্যাস। ফলে মুসলিমগণের নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের জামা'আত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত

তারা অনারবী আধিপত্য বিস্তারকারীদের শিকারে পরিণত হয়। মুসলিমদের প্রত্যেক সুন্নাতপন্থি ইমাম কি আমাদের ইমাম নন? ক্বিয়ামতের মাঠে কি আমরা তাদের দলভুক্ত হয়ে উঠবনা? হায় আফসোস অন্ধভাবে পক্ষ অবলম্বনকারীদের জন্য। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং তাদেরকে তোমার সিরাত্বে মুস্তাক্বীমের দিকে পথ দেখাও।

মাযহাব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আপনি যদি যথাযোগ্য তদন্ত করেন, তাহলে অপনার নিকট একথা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যে, এই মাযহাবসমূহের বিস্তার, প্রচলন ও শোভাবর্ধন করেছে ইসলামের শত্রুরা। মুসলিমদেরকে বিভক্ত করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করার মানসেই তারা এরূপ করেছে। অথবা ইয়াহুদী খ্রীস্টানদের মত হবার জন্য মূর্খ মুসলিমগণ তাদের অনুকরণ করে এ মাযহাবসমূহ আবিষ্কার করেছে। বহুক্ষেত্রে মুর্খদের অবস্থা এরকমই দেখা যায়। আর অন্ধ গোঁড়াপন্থী মূর্খদের সংখ্যা সর্বকালে ও সর্বযুগে বেশীই হয়ে থাকে। তারা ইনসাফ কী জিনিস বুঝেনা এবং হক্ব বাত্বিলের মধ্যে পার্থক্যেরও ধার ধারেনা।

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার ও ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন- রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কথা যখন ছহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, সেক্ষেত্রে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা চলে না। গ্রহণ ও আমল করার জন্য আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সুন্নাতই অধিক হক্বদার। আর এটাই প্রত্যেক মুসলমানের কাজ হওয়া উচিত। তাক্বলীদপন্থীরা রায় (মতামত) ও মাযহাবকে যেভাবে কুরআন হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, ঐ রকমটি করা আদৌ উচিত হবেনা। জ্ঞান প্রসূত সম্ভাবনা, মনগড়া ধারণা ও শয়ত্বানী একগুয়েমিকে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার (মূলবাণীর) বিরোধিতায় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। অতএব একথা বলা যাবে না যে, এই গবেষক সম্ভবতঃ এ দলীল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু পরিত্যাগযোগ্য কোন কারণ থাকায় অথবা এর বিপরীতে অন্য কোন দলীল হয়ত তাঁর জানা ছিল তাই তিনি উক্ত দলীল গ্রহণ করেন নি। কারণ এ ধরনের (অনুমান ভিত্তিক) কথা বলাই হচ্ছে গোঁড়া ফক্বীহদলের অভ্যাস। আর মূর্খ মুকাল্লিদগণ তাদের সেই কথা মানতে ঐক্যবদ্ধ।

ওমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা জারি করেছেন, তাই সুন্নাত। অতএব ভ্রান্তিপূর্ণ রায়কে মুসলিম উম্মাহর নিকট সুন্নাত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করোনা। মহান 'উমারের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপর আল্লাহ খুশী হোন। ভবিষ্যতে এ রকম ঘটবে, সে সম্পর্কে যেন তাঁকে ইলহাম করে তখনই জানানো হয়েছিল। তাই তিনি সতর্ক বাণী করে গেছেন। আর সে জন্যই আমরা এ যুগে দেখতে পাই যে- রাসূলের (ﷺ) সুন্নাত বিরোধী এবং আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী রায় (মতামত)-কে এক শ্রেণীর লোকেরা সুন্নাত বানিয়ে নিয়েছে। দ্বীনের অংশ জানছে, মতবিরোধ দেখা দিলে তারই দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং বলছে যে, এটাই আমার মাযহাব। মহান আল্লাহর শপথ এটা নিঃসন্দেহে একটি মসীবত ও বিপদ এবং মূর্খতা ও ধর্মীয় অন্ধ গোঁড়ামিজনিত রোগ, যাতে আজ ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিম আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই আফসোসের সাথে বলছি- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন।

ইমাম আব্দুর রহমান আল আওযাঈ (রহ) বলেন- হে মুসলিম, তুমি নেককার পূর্ব পুরুষের রীতিকে আঁকড়ে ধর, মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও তুমি তা ছেড়ো না এবং মনীষীদের উক্তি যতই মনোমুগ্ধকর হোকনা কেন, তা গ্রহণ থেকে সাবধান থাকো।

عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ

বিলাল ইবনু আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত- তাঁর বাবা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার বলেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেন- "তোমরা মহিলাদেরকে সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে বাধা দিওনা। বিলাল বললেন- আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। একথা শুনতেই আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি

আমাকে বলতে শুনছ যে, রাসূল (ﷺ) তাদেরকে (মসজিদে যেতে) বাধা দিতে নিষেধ করেছেন ; আর তুমি বলছ যে, তুমি তাদেরকে বাধা দিবে।[9]

কুরআন হাদীসের উপর আমল করাই ছিল ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব

"রওযাতুল উলূম আযযান্দবী সিয়াহ" গ্রন্থে হেদায়ার লেখক হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ হানীফা (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হল– যখন আপনার কোন কথা আল্লাহর কিতাবের বিরোধী হয়, তখন কী করতে হবে? তিনি বলেন– আমার কথা বাদ দিয়ে তোমরা আল্লাহর কিতাবের কথা ধর। আবারো প্রশ্ন করা হল– আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কোন হাদীস বিরোধী যদি হয়, তাহলে কী করতে হবে? তিনি বলেন– আমার কথা পরিত্যাগ করে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের কথা ধর। তাঁকে আবারো প্রশ্ন করা হল– সহাবার (رضي الله عنه) কথার বিরোধী যদি হয়, তাহলে কী করতে হবে? তিনি বলেন– আমার কথা বাদ দিয়ে তোমরা ছাহাবার (رضي الله عنه) কথা ধর।

'ইমতি'আ' গ্রন্থে আছে যে, বায়হাক্বী স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেন–ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন– আমার কোন কথা রাসূল (ﷺ)-এর কথার বিপরীত প্রতীয়মান হলে, রাসূলের (ﷺ) ছহীহ হাদীস গ্রহণ করাই সর্বোত্তম হবে। অতএব আমার তাক্বলীদ করোনা। ইমামুল হারামাইন উক্ত কথাটি ইমাম শাফেঈ হতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। "আলকাফী" গ্রন্থে আছে যে, গবেষক মুফতীর ফত্ওয়ার বিপরীতে যদি রাসূল (ﷺ)-এর সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে (সে ক্ষেত্রে) হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে এতে কোন প্রকারের দ্বিমত

[9] সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সলাত, বাব خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً, হাদীস নং ৪৪২।

নেই। কারণ, রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস মুফতীর কথায় পরিত্যাজ্য হতে পারে না এবং মুফতীর কথার চেয়ে সহীহ হাদীসের মর্যাদা কোন দিন কমও হতে পারে না। মুফতীর কথা যখন শরীয়তের দলীল হতে পারে, তাহলে রাসূল (ﷺ)-এর কথা তো শরীয়তের দলীল হবার ক্ষেত্রে বেশী হক্বদার ও যুক্তিযুক্ত হবে।

"ই'লামুল মুওয়াককিঈন"[10] গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন যে, কিয়াস ও রায়ের উপর জঈফ হাদীস অগ্রাধিকার পাবে–এ মর্মে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) সহচরবৃন্দ সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তার মাযহাবও এ কথার উপর ভিত্তিশীল। অতএব যে ব্যক্তি বলে যে, হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব নয় কিংবা জায়েয নয় সে ব্যক্তি আল্লাহর হুজ্জত (দলীল)-কে শুধু ধারণা ও খেয়াল খুশীর বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যানেরই ইচ্ছা করেছে–একথা ছাড়া আমরা কিছুই মনে করতে পারি না। এ রকম আচরণ কোন মুসলিমের হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি হাদীস না বুঝতে পারার অযুহাত পেশ করে, সে মুসলিমই নয়। কারণ, আল্লাহ (ﷻ) কুরআন নাযিল করেছেন–অর্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এবং রাসূলকে (ﷺ) নির্দেশ করেছেন সেই কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সকল মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য।

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন ঃ

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ ঃ (হে নবী) যেন আপনি মানুষের নিকট (বিশ্লেষণ সহ) বর্ণনা করেন– যা তাদের নিকট (প্রভুর পক্ষ থেকে) নাযিল করা হয়েছে।

[সূরা নাহল ৪৪]

অতএব কীভাবে বলা যেতে পারে যে, রাসূলের (ﷺ) কথা অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যা মানুষের বোধগম্য নয়। কেবল একজন মানুষের (মাযহাবের ইমামের) পক্ষেই তা বোধগম্য ছিল। তাও সেটা আদি যুগের

[10] ই'লামুল মুওয়াককিঈন আন রব্বিল আলামীন, দারুল জাইল, বৈরূত ১৯৭৩ সাল।

ব্যাপার। বর্তমানে তো তা কারো বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। তাদের এরূপ কথা বলার পিছনে কারণ এই যে, তারা ধারণা করে থাকেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ কোন মুজতাহিদ আসেননি। আর এ ধরনের উক্তি সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তির মুখ থেকেই বেরিয়ে থাকতে পারে যার ধ্যান-ধারণা ছিল যে, তার উক্তিগুলোর কুরআন-হাদীস বিরোধী হবার ঘটনা জনসাধারণ যেন কিছুতেই জানতে না পারে। অতঃপর বলা শুরু হয়ে যায় যে, কুরআন-হাদীস থেকে হুকুম আহকাম বের করার মত বুঝের (জ্ঞানের) অধিকারী হওয়া শুধু মুজতাহিদগণের পক্ষেই সম্ভব। অতঃপর মুজতাজিদ হবার অধিকারকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হয়। অতঃপর কথাগুলো তাদের জনমুখে ছড়িয়ে যায়। আল্লাহই বিষয়টির বাস্তবতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত।

কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ কোন মাযহাব গ্রহণের উদ্যোগ কেউ যেন ভবিষ্যতে নেওয়ার সুযোগ না পায় সম্ভবত" সেই জন্য এক শ্রেণীর লোকেরা ইজতিহাদ ধর্মীয় গবেষণাকে একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আবার এক একদল লোক আরো অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে, এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে যাওয়া এবং এক মাযহাবকে অন্য মাযহাবের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করা শরীয়তে জায়েয নেই। এসবের পিছনে উদ্দেশ্য তাদের একটাই–আর তা হচ্ছে-মানুষ যেন ঠিক বেঠিক যাচাইয়ের কোন পথ না পায় এবং সে বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহও যেন না থাকে। অথচ প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোকেরই জানা আছে যে, আল্লাহর দ্বীনে এ ধরনের কোন কথার স্থান নেই এবং চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং এগুলোর অধিকাংশই যুক্তি ও কুরআন-হাদীস বিরোধী। তারপরও বহু আলেমকে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে দেখা যায়। অথচ রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যই হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় অবশ্য কর্তব্য। এবং ছহীহ শুদ্ধ সনদে মুখস্থ শক্তিতে দৃঢ় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক রাসূলের (ﷺ) বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রতি তারা মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছে না। কিন্তু তাদের সমস্ত লক্ষ্য

নিয়োজিত থাকছে মাযহাবের ইমামগণের উক্তির প্রতি যা মাযহাবী কিতাবসমূহে সনদবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। অতএব তারা যখন হাদীস কুরআনের অনুকূলে হওয়ার জন্য কাউকে অন্য ইমামের কথাকে প্রাধান্য দিতে দেখে, তখন তাকে বিদআতী, পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করে। কাজেই "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" না বলে পারছিনা।

বস্তুত" প্রত্যেক মুসলিমের উপরে সেই আমলই ওয়াজিব, যা রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অতএব এর বিরুদ্ধাচরণ করলে, তার পরিণতি হবে আরো ভয়ঙ্কর। কেনইবা তা ভয়ঙ্কর হবে না। যেহেতু আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেছেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থ ঃ "অতএব যারা তাঁর (রাসূলের ﷺ) নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে ভয় করুক যে বালা মুছীবত তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর ৬৩]

কাজেই নির্ভরযোগ্য হাদীস পাওয়ার পর তাক্বলীদের উপর জড়তাচ্ছন্ন থাকা মুসলিম ব্যক্তির কার্য হতে পারেনা। এখন তারপরও যদি জড়তা না দূর হয়, তাহলে যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ নিম্নের আয়াতটি এরশাদ করেছেন, তাদের সাথে সেই জড়তাচ্ছন্ন ব্যক্তির খুব মিল রয়েছে।

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করছেন–

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

অর্থ ঃ "আর আপনি যদি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের) নিকটে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার ক্বিবলা মেনে নিবেনা।" [সূরা আল-বাক্বারাহ ১৪৫]

সুতরাং মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে হাদীস গ্রহণ করা এবং মাযহাবের অনুসরণ যেন তাকে হাদীস গ্রহণে বাধা দিতে না পারে।

কেননা আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন ঃ

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থ ঃ "তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি প্রত্যর্পণ কর।" [সূরা আন-নিসা ৫৯]

বিবাদ বা মত পার্থক্যে রাসূলের (ﷺ) কথা গ্রহণই হচ্ছে তাঁর প্রতি প্রত্যর্পণ। আর যেহেতু ইমামগণের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান, বিধায় রাসূলের (ﷺ) কথা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে।

মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন এবং কখনো ঠিক করেন, কিন্তু রাসূল (ﷺ) ভুলের উর্ধ্বে

আশ্চর্য হতে হয় এ জন্য যে, তারা (মুকাল্লিদরা) জানে যে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত ভুল-সঠিক উভয়ই হতে পারে–এটা তাদের আক্বীদার (ধর্ম বিশ্বাসের) অন্তর্ভুক্ত। অথচ নবী (ﷺ) ভুলের উর্ধ্বে, তারপরও তাদেরকে মুজতাহিদের কথা মান্য করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করতে এবং নবীর (ﷺ) কথা বর্জন করতে দেখা যায়। অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মুজতাহিদের কথার উপরও থাকেনা। বরং মুজতাহিদদের মুক্বাল্লিদরা আজে বাজে বহু লেখকের কথাকে মাযহাব হিসেবে আঁকড়ে ধরছে এবং তারই জন্য একগুঁয়েমি প্রদর্শন করছে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, খুলাছাতুল কায়দানী নামক জনৈক মাযহাবীর লিখিত কিতাব খুলাছার কথা মত মাওয়ারাউন্নাহ্‌র অঞ্চলের মূর্খ হানাফীগণ তাশাহ্হুদে তর্জনী দ্বারা ইশারা করাকে হারাম মনে করে এবং তা থেকে বিরত থাকে। অথচ এটি রাসূল (ﷺ) হতে প্রমাণিত একটি সুন্নাত। সমস্ত ছাহাবী এবং প্রায় সকল মুজতাহিদ ইমামগণ এমনকি ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.) প্রমুখ ইমামগণ থেকেও এর উপর আমল করা প্রমাণিত আছে। একথা হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ যেমন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌শায়বানীর 'মুওয়াত্তা', ত্বাহাবীর "শারহু মায়ানীল আছার" ফাত্হুল ক্বাদীর, আল-'ইনায়াহ্ ও উমদাতুল ক্বারীর মধ্যে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। অতএব বিষয়টি একটু ভেবে দেখুন।

শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী বলেন– প্রত্যেক মুসলিমের কুরআন-হাদীসের অর্থ জেনে, বুঝে ও অনুসন্ধান করে শরীয়তী হুকুম আহকাম বের করা উচিত। এখন যদি কারো এ যোগ্যতা না থাকে, তাহলে সে (অমুক্বাল্লেদ) আলেমগণের তাক্বলীদ করবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করবেনা। কেননা এতে মাযহাবের ইমামকে নবী বানিয়ে নেওয়ার মত দেখায়।

এবং প্রত্যেক মাযহাবের সর্বাধিক দলীল সমৃদ্ধ সিদ্ধান্তই তার গ্রহণ করা উচিত হবে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রুখছতসমূহ গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয হবে। নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরার যে কথা এই যুগের লোকেরা আবিষ্কার করেছে, তারা তো এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে যাওয়াকে সঠিক মনে করেনা এবং তাদের মতে তা জায়েযও নয়। এটা মূর্খতা, বিদআত ও অন্যায় ছাড়া কিছু নয়। আমরা এদেরকে দেখছি যে, এরা অ-রহিত বহু ছহীহ্ হাদীস ছেড়ে দিয়ে সনদ বিহীন নিজস্ব মাযহাবী কথাবার্তাকে আঁকড়ে ধরছে।

ইমাম শাফেঈ বলেন–যে ব্যক্তি বস্তুর হারাম বা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ করে-যার বিপরীতে ছহীহ্ হাদীস সাব্যস্ত আছে, কিন্তু সেই হাদীসের উপর আমল করতে তাকে বাধা দান করছে শুধু তার তাক্বলীদ – তাহলে সে ব্যক্তি তার মুক্বাল্লাদ (অন্ধ অনুসৃত) ইমামকে আল্লাহর স্থলে রব্ব বানিয়ে নেয়। সে তার জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে দেয় এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করে দেয়। এহেন ক্ষেত্রে আমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" না বলে পারছিনা।

আশ্চর্যের আশ্চর্য কথা এই যে, যখন এদের নিকট পৌঁছে যে কোন ছাহাবী কারণ ছাড়াই কোন ছহীহ্ হাদীসের বিপরীতে কোন আমল করেছেন, তখন তারা বলবে–তাঁর নিকট উক্ত ছহীহ্ হাদীস পৌঁছেনি যার ফলে তিনি এমনটি করেছেন। ছাহাবীদের (রাঃ) ক্ষেত্রে একথা বলতে তাদের কাঠিন্য বোধ হয় না। এ ধরনের কথা বলা ঠিকই, ভুল কিছুনা। তবে মুক্বাল্লাদ ইমামের কথার বিপরীতে কোন ছহীহ্ হাদীস তাদের নিকট

পৌছলে, তখন কিন্তু তারা ঐ কথা বলে না। বরং সেই হাদীসের নিকটবর্তী দূরবর্তী বিভিন্ন প্রকারের তাবীল করা শুরু করে ফেলে, কিছু ক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত বিচ্যুতিও ঘটিয়ে ছাড়ে। এখন যদি তাদেরকে কেউ বলে যে, হাদীস পরিত্যাগের নির্ভরযোগ্য কারণ তো দেখা যাচ্ছে না তারপরও তোমাদের মুক্বাল্লাদ ইমাম যখন হাদীসটির উপর আমল করেননি, তখন হতে পারে যে, তাঁর নিকট উক্ত হাদীসখানা পৌছেনি, তাই তিনি আমল করেননি। একথা বলতেই কিন্তু তারা এর প্রবক্তার উপর ক্বিয়ামত করে ফেলবে এবং জঘন্যতম ভাষায় তাকে গালমন্দ করবে। কারণ মুক্বাল্লাদ ইমামের ক্ষেত্রে একথা ভাবতে তাদের খুবই কঠিন হয়। অতএব একটু ভেবে দেখুন–সঠিক ইসলামী জ্ঞানের মিসকীনদের কথা। তারা ছাহাবীদের নিকট হাদীস পৌছেনি একথা মানতে পারে, কিন্তু মাযহাবের প্রভুদের ক্ষেত্রে তা মানতে পারে না। অথচ দুইয়ের মধ্যে আকাশ ও পাতাল ব্যবধান। তাদেরকে হাদীস গ্রন্থ পড়তে, মুত্বালায়া (গভীরভাবে অর্থ বুঝে পড়াশুনা) করতে এবং পড়াতে দেখবেন–কিন্তু আমলের জন্য নয় বরং বরকত হাছিলের জন্য আর যখন তারা নিজেদের মাযহাব বিরোধী কোন হাদীস পায়, তখন তার বহুবিধ তাবীল করতে তাদেরকে দেখবেন।[১১] আর যখন তাবীল করেও মাযহাবের পক্ষে কোন সুরাহা বের করতে পারে না–তখন তারা বলে- আমরা যাদের মুক্বাল্লিদ হাদীস বিষয়ে তারা আমাদের থেকে অনেক বেশী জানতেন। অথচ তারা একটুও ভেবে দেখছেনা যে, এভাবে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুজ্জত নিজেরাই ক্বায়েম করে ফেলছে।

আর যখন তারা স্ব মাযহাবের পক্ষে কোন হাদীস পায়, তখন খুশীতে আটখানা হয়ে পড়ে। আর যখন মাযহাবের বিপরীতে কোন হাদীস পায়, তখন হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনা।

[১১] মাযহাবের প্রতিকুল হাদীসগুলোর যে যত তাবীল (অপব্যাখ্যা) করতে পারে, সে তত বড় মুহাদ্দিস ও শাইখুল হাদীস উপাধি লাভ করে। এমন কি এদের কাউকে এমন ধৃষ্টতা পোষণ করতে দেখা গেছে যে, বুখারীর হাদীসের অনুবাদ করতে, গিয়ে ঐ জাতীয় হাদীসগুলোকেই বাদ দিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এরশাদ করেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ "অতএব আপনার পালনকর্তার ক্বসম, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়-বিচারক না মানবে এবং আপনি যে ফায়সালা দেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে ক্বুবুল না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মু'মিন হতে পারবেনা। [সূরা আন-নিসা ৬৫]

ইমাম মালেকের (রহ.) মুদাউওয়ানা গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সানাদ ইবনু 'আনান বলেন– কোন সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি তাক্বলীদকে একান্তভাবে (ধর্ম হিসেবে) মেনে নিতে সম্মত হতে পারে না। কারণ তাক্বলীদ হচ্ছে একান্ত নিরেট মূর্খ কিংবা বোধশক্তিহীন হঠকারীর কাজ। সবার জন্য তাক্বলীদ করা হারাম-একথা আমরা বলছিনা। তবে (আলেমদের জন্য) আমরা দলীল ও ইমামদের উক্তিসমূহ জানা ওয়াজিব মনে করি এবং সাধারণ লোক আলেমদের তাক্বলীদ করবে-একথা আমরা বলি।[১২] আর তাক্বলীদ শব্দের অর্থ হচ্ছে-দলীলপ্রমাণ ছাড়াই অপরের কোন কথা গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর করা। অতএব তাক্বলীদ দ্বারা মূলতঃ কোন জ্ঞান অর্জিত হয় না। অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাব মেনে চলা শরীয়তের ভিতর একটি নবাবিষ্কার বা বিদআত। কারণ আমরা এটা খুব সুন্দরভাবে জানি যে, ছাহাবীদের যুগে কোন মাযহাব ছিলনা। তারা কুরআন ও হাদীসকে সার্বিকভাবে মেনে চলতেন এবং কোন বিষয়ে দলীল না পাওয়া গেলে, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের আশ্রয় নিতেন। তাবেঈগণও তাদেরকে অনুসরণ করে গেছেন। অতঃপর হিজরী তৃতীয় শতকের ইমামগণ যেমন ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদও (রহঃ) পূর্বসুরীদের মতই জীবন যাপন করেছেন। তাঁদের যুগেও কোন নির্দিষ্ট ইমামের

[১২] 'আলিমের তাকলীদ মানেই তার ইলম (জ্ঞানের) তাকলীদ আর ইলম তো হল কুরআন ও সুন্নাহর কথা। কখনই কোন আলিমের ব্যক্তিগত মতামত বা তার খেয়াল খুশী নিঃসৃত কথার তাকলীদ জায়িয নয়। –সম্পাদক

মাযহাবের উপর লেখা পড়া হতনা। আর এ সকল ইমামগণকে যারা অনুসরণ করেছেন, তারাও তাদের মতই ছিলেন। যার ফলে ইমাম মালেক ও তার মত ইমামগণের কত কথাতেই না তাদের সহচররা বিরোধিতা করেছেন। তাই তাক্বলীদ পন্থীদের কর্মকাণ্ড দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ হচ্ছে। কীভাবে তারা বলছে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ করার বিষয়টি আগের যুগ থেকেই চলে আসছে। অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় প্রশংসিত যুগসমূহের পরিসমাপ্তির পর দুই শত হিজরী সনের পরে এই মাযহাবের আবিষ্কার ঘটে।

আমি বলি ঃ কুরআন-হাদীস বিরোধী হলেও নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদকে নিজস্ব দ্বীন বা মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সানাদ (রহ.) যে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন, তা অত্যন্ত সত্য কথা । কারণ এটা যে নিন্দনীয় বিদআত এবং জঘন্যতম স্বভাব তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এরই মাধ্যমে ইবলীস শয়তান মুসলমানদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে তাদের ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার বীজ বপনের অপচেষ্টা চালিয়েছে। কাজে দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকে নিজ মুক্বাল্লাদ মুজতাহিদ ইমামকে ছাহাবীদের চেয়েও অধিক সম্মান করে এবং মাযহাবের পক্ষে কোন হাদীস পেলে খুশী হয়ে সেটাকে গ্রহণ করে ও মেনে নেয়। আর যখন অন্য ইমামের মাযহাবের স্বপক্ষে কোন দ্বন্দ্বহীন, অরহিত ছহীহ্ হাদীস পায়, তখন সেই হাদীসের দূরবর্তী বহু সম্ভাবনামূলক অর্থ বের করে হাদীসটিকে এড়িয়ে চলে এবং নিজ ইমামের মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য যুক্তি খুঁজতে থাকে। এক্ষেত্রে তারা ছাহাবা, তাবেঈন ও কুরআন-হাদীসের বিরোধিতাকে মোটেই পরওয়া করে না। তারা হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখলে তাদের মত বিরোধী সকল হাদীসের অর্থগত বিচ্যুতি সাধন করে। এতে অপারগ হলে দলীল ছাড়াই রহিত হওয়ার দাবী তোলে ঝগড়ার সৃষ্টি করে অথবা বলে হাদীসটির উপর আমল নেই।

জড়তাচ্ছন্ন মুক্বাল্লিদরা তাক্বলীদকে দ্বীন ও মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। কারণ তাকে হাজারও দলীল শুনালেও সে তার প্রতি কান

দিবে না, বরং সার্বিকভাবে পলায়নের চেষ্টা করবে–যেভাবে সিংহের ভয়ে সন্ত্রস্ত গর্দভ পালিয়ে থাকে। বুখারা অঞ্চলের অধিকাংশ লোক এবং তাদের অনুরূপ ভারত উপমহাদেশ ও তুরস্কের লোক-যারা হারামাইন শারীফাইনের সন্নিকটবর্তী তারাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের হাতে জপমালা কখনো কখনো গলাতেও ঝুলায়; মাথায় গম্বুজের মত পাগড়ী এবং সব সময় দালায়েলুল খায়রাত, খাতমে খাজা, ক্বাছীদায়ে বুরদাহ্‌র মত বই ছাওয়াবের আশায় পড়েই চলেছে।[১৩] অথচ তাশাহহুদে তারা তর্জনী দ্বারা ইশারা করেনা। আমি একাধিকবার তাদেরকে প্রশ্ন করেছি–কেন তোমরা ইশারা করোনা? এটাতো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত। এ আমল তো ছাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও মুজতাহিদ ইমামগণও করেছেন, এবং এটাতো শয়তানের জন্য লৌহ লাঠি দ্বারা প্রহারের চেয়ে কঠিনতম। তাদের মুখপাত্র উত্তরে বলেছে–আমরা হানাফী মাযহাবের লোক; আমাদের মাযহাবে এটা জায়েয নেই বরং হারাম তাই আমরা করি না। আমি তখন তাদেরকে ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্ত্বা, ত্বাহাবীর শারহু মায়ানীল আছার এবং ইবনুল হুমামের ফাত্হুল ক্বাদীর গ্রন্থে লিখিত কথাগুলো বর্ণনা করে শুনালাম। তখন সে উত্তর দিল– এটা পূর্ববর্তীদের কথা, পরবর্তীরা তা করতে নিষেধ করেছেন এবং তার উপর তারা আমল করেননি। অতএব সেটা রহিত হয়ে গেছে। একথা ছলাতুল মাসঊদী ও খুলাছাতুল কায়দানিয়াহ্ গ্রন্থে লেখা আছে। কাজে এ আমল করা যাবেনা। মূর্খরা এহেন হক্বের পরিপন্থী দজ্জালদেরকেই নেককার ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কশীল ভাবছেন। হ্যাঁ, এরা আল্লাহর বন্ধু না হলেও শয়তানের বন্ধু তো অবশ্যই। অতএব আমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পড়ি।

---

[১৩] এ সকল রিসালা ও ক্বাছীদাহ্ পাঠে কোন ছাওয়াব নাই। কারণ, এগুলো রাসূল (ﷺ) থেকে প্রাপ্ত কিছু নয় এবং শরীয়ত সমর্থিতও নয়। বরং বিদআত ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা থাকায় এগুলো পাঠে গুনাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবুল ক্বাসেম আল কুশায়রী (রহ.) বলেন-আমরা যারা হক্বকে পেতে চাই, তাদের ওয়াজিব হবে নির্ভুল রাসূল (ﷺ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আর যে ইমাম ভুলের উর্ধ্বে নয়, তার তাক্বলীদ না করা। অতএব ইমামগণের প্রত্যেক কথাকেই আমরা কুরআন-হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাই করব। কুরআন-হাদীসের সাথে যা মিলে, তা গ্রহণ করব এবং যা মিলে না, তা বর্জন করব। শরীয়তের প্রবর্তক রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করার জন্য আমাদের নিকট দলীল আছে; কিন্তু ফক্বীহ্ ও ছুফীগণের কথা-কার্য কুরআন-হাদীস বিরোধী হলে, তা অনুসরণের জন্য আমাদের নিকট কোন দলীল নেই। অতএব দলীল থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের মাযহাবেও যে বিষয়ে তাক্বলীদ ঠিক নয় সেই ক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি তাক্বলীদকে জড় বস্তুর ন্যায় জড়িয়ে ধরে থাকে, সে ব্যক্তি কতইনা ক্ষতির ভিতরে আছে-তার জন্য আফসোস না করে পারছিনা। শরীয়তের দলীল থেকে শুরু করে ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি ও ছুফীদের নিয়ম-নীতিও তাকে নিন্দা করে এবং তার এ কার্যকে প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে তারই সুনাম গায় যে অনুসন্ধান করেছে, সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং সংশয় পূর্ণ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মুক্বাল্লাদ ইমামের কোন সিদ্ধান্তকে কুরআন-হাদীস বা ইজমা বা প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত পাওয়ার পরও সেই ক্ষেত্রেও তার তাক্বলীদের উপরে অটল থেকেছে, সে উক্ত ইমামের অনুসারী হওয়ার স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছু নয়। তাঁর তাক্বলীদের ক্ষেত্রেও তাকে মিথ্যুক বলা হবে। বরং সে নিজ কুপ্রবৃত্তি ও গোঁড়ামির অনুসরণকারী। ইমামগণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইমামগণের সাথে তার সম্পর্ক সেরূপ, যেরূপ সম্পর্ক ছিল আহলে কিতাব পন্থীদের নিজ নবীগণের সাথে। কারণ, প্রত্যেক ইমামই নিজ সহচরদেরকে শরীয়তের নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারো সিদ্ধান্তের মধ্যে হক্ব সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না

অতএব অন্য কারো সিদ্ধান্তে হক্ব সীমাবদ্ধ থাকার ধারনাকারীর ইমাম চতুষ্টয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। সে বিদআতী এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী পথভ্রষ্ট বিভ্রান্তকারী, এতে কোন মুসলমানের সন্দেহ থাকার কথা নয়। সুতরাং হক্ব রিসালাতের ধারক ও বাহক প্রিয় নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ। অন্য কারো সিদ্ধান্তে মোটেই নয়। কারণ হক্ব তো তাই, যা তিনি আল্লাহ (ﷻ)র নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

অতএব যখনই কোন বিচারক ভেবে দেখবেন, তখন তার নিকট একথা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দলীলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাবের তাক্বলীদ করা- একটি বড় ধরনের মূর্খতা ও ভয়াবহ বিপদই শুধু নয় বরং এটা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও গোঁড়ামির পরিচায়কও বটে। এবং মুজতাহিদ ইমামগণ এর বিরুদ্ধে একমত। কারণ-তারা প্রত্যেকে দলীলবিহীন তাক্বলীদের নিন্দার সাথে সাথে, তা বাত্বিল হওয়ার অভিমতও ব্যক্ত করেছেন বলে ছহীহ্ভাবে জানা গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি দলীলের অনুসরণ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে নিজ ইমাম সহ অন্যান্য সকল ইমামেরও অনুসরণ করে। আর তখনই তাকে কুরআন-হাদীসের অনুসরণকারী বলা হবে। সে নিজ ইমামের মাযহাব থেকে বহির্ভূত হয়ে গেছে-একথা তার জন্য কিছুতেই প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে নিজ ইমাম সহ অন্যান্য সকল ইমামের মাযহাব থেকে তখনই বহির্ভূত ধরা হবে, যখন সে দলীলের বিরুদ্ধে তাক্বলীদের উপর শক্ত অবস্থান নিয়ে অটল থাকবে। কারণ তার ইমামের নিকট দ্বন্দ্বহীন হাদীসটি পৌঁছলেই নিজ সিদ্ধান্ত বর্জন পূর্বক হাদীসেরই অনুসরণ করতেন। সুতরাং এমতাবস্থায় তাক্বলীদের উপর অটল ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর নাফরমান এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী ছাড়া কিছুই নয়। তার সাথে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন সম্পর্ক নেই এবং সে শয়তানের দলভুক্ত কুপ্রবৃত্তির অনুসারী।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে নিজ খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জেনে শুনে পথভ্রষ্ট করেছেন? [সূরাতুল জাছিয়াহ্ (৪৫) ঃ ২৩]

কাজেই তার অন্তর থেকে ঈমানী আলো বেরিয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াতের পরে অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

রাবী বিন সুলায়মান আলজীযী বলেন " আমি শাফেঈর (রহ.) মুখ থেকে শুনেছি–এক ব্যক্তি তাকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন " নবী (ﷺ) থেকে এমর্মে এই এই কথা বর্ণিত আছে। তখন প্রশ্নকারী বলেন- হে আবু আব্দিল্লাহ্, তাহলে আপনার মতও কি সেটাই নাকি? একথা শুনতেই ইমাম শাফেঈ (রহ.) কাঁপতে লাগলেন এবং রেগে হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়ে বললেন– তোমার ধ্বংস হোক; রাসূল (ﷺ) থেকে আমি যে হাদীস বর্ণনা করছি, সেটা যদি আমার মত না হয়-তাহলে কোন যমীন আমাকে স্থান দিবে আর কোন আকাশই বা আমাকে ছায়া দিবে? হ্যাঁ, অবশ্যই সেই হাদীসই আমার মত। একথাগুলো তিনি বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

হুমায়দীর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন যে, ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন " তুমি যদি আমার কোমরে খ্রীস্টানী বেল্ট বাঁধা দেখ, তাহলে কি তুমি ভাববে না যে, আমি গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসলাম? যদি তাই হয়, তাহলে আমার মুখে নবী (ﷺ)-এর বাণী শুনে তুমি কেমন করে আমাকে জিজ্ঞেস কর যে, এটাই কি আপনার মত? আমি নবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করব আর সেটা আমার মত হবে না? একথা শুনে বড়ই আশ্চর্যবোধ হচ্ছে।

জেনে রাখুন-বেশীর ভাগ লোকই ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্বল্প সংখ্যক লোকই লাভবান। এখন যে ব্যক্তি নিজ লাভ ক্ষতির হিসাব জানতে চায়-সে গভীরভাবে তার কর্মকে ভেবে দেখুক এবং নিজেকে কুরআন-হাদীসের

মানদণ্ডে তুলে ধরুক। কুরআন-হাদীস অনুযায়ী তার কর্ম হয়ে থাকলে, বুঝতে হবে- সে ব্যক্তি লাভবান। আর দ্বন্দ্ব বাধলেই বুঝতে হবে- সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তার জন্যই আফসোস। মহান আল্লাহ-ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির এবং লাভবানদের লাভের সংবাদ কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আছরের শপথ করে বলেছেন-সকল মানুষ ক্ষতির ভিতর রয়েছে। তবে তারা নয়, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাহার ঘটেছে। এখন যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ যে, সে আকাশে উড়ছে বা পানিতে চলছে বা গায়েবের সংবাদ দিচ্ছে অথচ শরীয়তের বিরোধিতা সে পুরোমাত্রাই করে চলেছে– সে এমন হারাম কাজও করছে-যার হালাল হওয়ার কোনই উপায় নেই এবং এমন ওয়াজিব কাজও যে করছেনা-যা ত্যাগ করা মোটেই জায়েয নয়, তাহলে তুমি জানবে যে, সে শয়তান ছাড়া কিছুই নয়। যাকে আল্লাহ মূর্খদের জন্য ফিতনার কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট ভ্রষ্টতার একটি মাধ্যম হওয়া তার জন্য কোন দূরের কথা নয়। কারণ শয়তান আদম সন্তানের রগে রগে চলে। দজ্জাল কাউকে জীবিত করবে ও কাউকে মৃত্যু দিবে এবং ভ্রান্তদের পরীক্ষার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টিও বর্ষাবে। অনুরূপভাবে কেউ সাপ ভক্ষণ করবে আবার কেউ তো আগুনে প্রবেশ করবে।

মীযান গ্রন্থে শা'রানী বলেন যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে বলেন– আপনি কি ইমাম আওযাঈর অনুসারী না ইমাম মালেকের অনুসারী? একথা শুনে তিনি উত্তরে বলেন- তোমার দ্বীন (ধর্ম) এদের কারুর তাক্বলীদ নয়। রাসূল (ﷺ) ও ছাহাবীদের (رضي الله عنهم) থেকে প্রাপ্ত শরীয়তই তুমি গ্রহণ কর। অতঃপর তাবেঈদের অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে। ইমাম আহমাদ (রহ.) আরো বলেন- তোমরা আমার তাক্বলীদ করোনা; মালেক, আবু হানীফা, শাফেঈ, আউযাঈ, ছাওরী এদের কারোরই তাক্বলীদ তোমরা করোনা। তারা যেখান থেকে দ্বীন গ্রহণ করেছে, সেখান থেকে তোমরাও দ্বীন গ্রহণ কর। ইমামগণের তাক্বলীদ ব্যক্তির ইসলামী জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক।

ইবনুল জাওযী স্বীয় গ্রন্থ "তালবীসু ইবলীস"-এ বলেন " যেহেতু চিন্তা ভাবনা ও গবেষণার জন্য বিবেকের সৃষ্টি, অতএব তাক্বলীদ করলে বিবেকের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়। আর আলোর জন্য যাকে মোমবাতি দেওয়া হয়েছে, সে যদি সেটাকে নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলে, তাহলে কতইনা খারাপ দেখায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী

জেনে রাখুন যে, মুজতাহিদের ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত আল্লাহর হুকুম নয়। যদি সেটা হুবহু আল্লাহর হুকুমই হত, তাহলে আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও অন্যান্যদের জন্য আবু হানীফা (রহ.)-এর ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা মোটেই ঠিক হত না। আর এজন্যই তো ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন যে, এটা আমার মত বা সিদ্ধান্ত, কেউ যদি এর চেয়ে ভাল কোন মত পেশ করে-তাহলে আমি তা ক্ববূল করব। সকল ইমামই তো বলেছেন যে, এটা আমাদের ইজতিহাদী মত, যার মনে চায় গ্রহণ করবে, আর যার মনে চায়না গ্রহণ করবে না।

মাছূমী বলেন- যে ব্যক্তি একজন ইমামেরই তাক্বলীদ করবে-আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তাক্বলীদের জন্য আপনার নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হল কী করে? এখন সে যদি উত্তর দেয় যে, তিনি নিজ যুগের সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। তাহলে আবারো প্রশ্ন আসে যে-তোমার নিজস্ব সাক্ষ্য অনুযায়ী তো তুমি ইলমের অধিকারী। আলেম না হলে তুমি কী করে জানলে যে, তিনি স্বীয় যুগে সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন? কারণ এটা তো তারই জানার কথা, যে সব মাযহাব জানে এবং মাযহাবের দলীল সহ রাজেহ্ (প্রাধান্য যোগ্য দলীল) মারজূহেরও (অপ্রাধান্য যোগ্য দলীল) জ্ঞানার্জন করেছে। কিন্তু অন্ধের ন্যায় মূর্খের পক্ষে তা কী করে সম্ভব হতে পারে? এখন তুমি যদি সব বড় বিদ্বানেরই তাক্বলীদ করতে চাও-তাহলে তো আবু বকর, ওমর, উছমান, আলী, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম

এরাই তো সকল মুসলমানের ঐক্যমতে তোমার ইমাম থেকে বড় বিদ্বান। (অতএব তাদেরই তাক্বলীদ কর)

মুকাল্লিদদেরকে এও প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তোমাদের ওমুক ওমুক ইমাম যাদের তোমরা তাক্বলীদ করছ এবং যাদের কথাগুলোকে তোমরা শরীয়ত প্রবর্তকের (রাসূলের ﷺ) মূলবাণীর স্থলাভিষিক্ত করে নিয়েছ, তাদের আগমনের পূর্বে লোকেরা কোন্ মাযহাবের উপরে ছিলেন? তোমাদের ধ্বংস হোক-তোমরা এখানেও ক্ষান্ত হওনি, বরং নিজ ইমামের কথাগুলোকে তোমরা শরীয়ত প্রবর্তকের মূলবাণীর চেয়ে অধিক অনুসরণযোগ্য করে নিয়েছ। বলতো দেখি- এদের আগমনের পূর্বে মানুষেরা হেদায়াতের উপরে ছিলেন? না গুমরাহীর ভিতরে ছিলেন?

তারা একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আগের লোকেরা হেদায়াতের উপরেই ছিলেন। আবারো তাদেরকে বলা হবে যে, আগের লোকেরা কুরআন-সুন্নাহ্ ও আছারের অনুসরণ বাদ দিয়ে অন্য কিসের অনুসরণ করতেন? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বাণী এবং ছাহাবীদের আছারের বিপরীতে এমন কোন জিনিসকে তারা অগ্রাধিকার দিতেন এবং তারই নিকট বিচার প্রার্থী হতেন? তখন তো অমুক অমুক ইমামের উক্তি ও অভিমত কোনটাই ছিলনা? তারপরও যদি বলি যে, তারা হেদায়াতের উপরেই ছিলেন, (তাহলে সেই হেদায়াতের উপরে আমরাও থাকব। কিন্তু সেটা না করে কেন আমরা ব্যক্তি বিশেষের তাক্বলীদের মধ্যে হেদায়াত খুঁজে চলেছি?) হেদায়াত তথা কুরআন-হাদীসের বাইরে আমরা কী খুঁজছি? হেদায়াতের পরে তো ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অতএব পালাবার স্থান কোথায়? একটু ভেবে দেখুন।

এটা কোন গোপন কথা নয়-মুক্বাল্লিদের প্রত্যেকটি দলই শুধু নিজেদের মুক্বাল্লাদ ইমামগণকে রেখে বাকী সকল ছাহাবী, তাবেঈ এবং শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উম্মাতের যত আলেম সকলকে এমন এক পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছে যে, তাদের কারোর কোন কথার তাদের নিকট কোন মূল্যায়ন নেই; তাদের ফত্ওয়ার প্রতি দৃষ্টিও দেওয়া যাবে না। তবে অনুসরণীয় ইমামের উক্তির বিপরীতে তাদের কোন কথা পাওয়া গেলে,

সেটাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে তৎপর হয়ে উঠতে হবে। এমনকি তাদের অনুসরণীয় ইমামের কথা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথার বিরুদ্ধে হয়, তখন ইমামের কথাকে ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথাকে তাবীল করে অর্থচ্যুত করতে হবে এবং বিভিন্ন পন্থায় তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এটাই যেন তাদের উপরে একান্ত ওয়াজিব কর্ম। তাদের এহেন বিদআতী ও দ্বীন ধ্বংসাত্মক গোঁড়ামির অভিযোগ আল্লাহর কাছেই করছি। আল্লাহ এ দ্বীনের হেফাযতের জিম্মাদারী নিয়েছেন। তাই তিনি যুগে যুগে এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন–যারা বরাবরই দ্বীনের প্রচার ও সংস্কার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন ও যাবেন। মহান আল্লাহ এ দায়িত্ব না নিলে, বিদআতপন্থীদের অপতৎপরতায় ঈমানী শক্তি তথা তার রুকনের বিদায় ঘণ্টা বাজবার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল। অতএব সেই ব্যক্তির অবস্থাতো সর্বাধিক মন্দ এবং সেই ব্যক্তিই তো ছাহাবী, তাবেঈনসহ সমস্ত মুসলিম আলেমের হক্বে পদাঘাত করে তাদের শানে সর্বাধিক বেআদবী করেছে যে তাদের কারুর কোন কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু নিজ ইমামের কথাই মেনেছে এবং তাঁকে যেন সে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর পরিবর্তে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তাক্বলীদপন্থীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিধানের, ছাহাবীদের অনুসৃত পথের এবং ইমামগণের আচরণের বিরোধিতা করেছে; আলেমদের বিপরীতে এরা পথ গ্রহণ করেছে; পূর্বসূরীদের পথকে উল্টিয়ে এরা দ্বীনের পরিস্থিতিকে উলট পালট করে ফেলেছে, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সমস্ত ছাহাবীদের কথার সাথে এরা জালিয়াতি করেছে। কারণ এরা মুক্বাল্লাদ ইমামের কথার সাথে তাঁদের কথাগুলোকে মিলিয়ে দেখেছে। মুক্বাল্লাদ ইমামের কথার সাথে যা মিলেছে, তা গ্রহণ করেছে ও তার উপর আমলও করেছে। আর যা মিলেনি, তা বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার উপর আমলও করেনি। তাদের মর্যাদাবানরাই এর উৎখাতে

সর্বপ্রকার কৌশল খাটিয়েছে। সুতরাং তারাই (মর্যাদাবানরাই) দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে দ্বীনদারদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলেছে। যার ফলে প্রত্যেক দলই নিজ অনুসরণীয় ইমামের (মাযহাবের) সাহায্য করে, তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে, তার বিরুদ্ধবাদীর নিন্দা করে এবং তারা যেন অন্য ধর্মের লোক-তাই তাদের কোন কথা অনুযায়ী তারা আমলও করেনা। অথচ সকলের উপর এমন একটি বিষয়ের আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল-যা তাদের সবার জন্য সমভাবে মান্য হওয়ার দাবী রাখে। আর তা হচ্ছে রাসূলে আযম মুহাম্মাদেরই (ﷺ) আনুগত্য কথা আর পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব্ব হিসেবে গ্রহণ না করা।

জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় আলেমদের উক্তি ও কিয়াসসমূহ তায়াম্মুমের পর্যায়ভুক্ত। আর তায়াম্মুম তো তখনই করা হয়, যখন পানি না পাওয়া যায়। সুতরাং কিতাব, সুন্নাহ এবং ছাহাবীদের উক্তি পাওয়া গেলেই তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে এবং তা অমান্য করে কোন ক্রমেই আলেমদের উক্তির দিকে যাওয়া যাবে না। কিন্তু পানি সহজলভ্য হওয়ার পরও পরবর্তীকালের মুক্বাল্লিদগণ তায়াম্মুমের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তারা ইমামদের মুক্বাল্লিদ পরবর্তী যুগের কিছু মুক্বাল্লিদ লোকের কথা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করছে। অথচ ইমাম বুখারী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আওযাঈ, ছুফ্য়ান ছাওরী ও তাদের মত ইমামদের কথা বা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বাছারী, আবূ হানীফা, মালেক (রহ.) ও তাদের মত (মূল) ইমামদের কথা যা তুলনামূলকভাবে গ্রহণ করা ঠিক ছিল কিন্তু তা তারা উপেক্ষা করেছে এবং সে অনুযায়ী ফত্ওয়াও দিচ্ছেনা ও আমালও করছেনা। তারা এখানেও ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদের (পরবর্তীকালের মুক্বাল্লিদদের) কথাকে তারা আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী ও ইবনে মাসঊদের (رضي الله عنهم) ফত্ওয়ার উপরও অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অতএব আগামীকাল আল্লাহর দরবারে তারা এই মুক্বাল্লিদগণের উক্তি ফত্ওয়াকে ছাহাবীদের উক্তি ও ফত্ওয়ার সমতুল্য করার পিছনে কী ওযর পেশ করবে? আর যারা ছাহাবীদের উক্তি ও ফত্ওয়ার উপরে অন্যদের উক্তি ও ফত্ওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তারাই

বা আল্লাহর দরবারে কী জওয়াব দিবে? আর তারাই বা কী জওয়াব দিবে যারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিরই শুধু বিধান ও ফত্ওয়া মেনে চলে অথচ ছাহাবীদের কথা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে?

এই উম্মতের পরবর্তীদের সংশোধন তাতেই সম্ভব যাতে সংশোধিত হয়েছে এর পূর্ববর্তীরা

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এ উম্মতের পূর্ববর্তীরা যে জিনিসের মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছে, তারই মাধ্যমে এর পরবর্তীদের সংশোধনও সম্ভব। আর এ উম্মতের পূর্ববর্তীরা তথা ভালরা যে কিতাব-সুন্নাত ও সালাফে ছালেহীনের (ছাহাবীদের) ইজমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন-এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অতঃপর মুসলমানরা আল্লাহর শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে যখনই অন্যান্য প্রভুদের খুশী করার জন্য খেয়াল খুশীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখনই আল্লাহ মুমিনদেরকে যে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলেন, তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন- এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, মুমিনগণকে আল্লাহ যেসব মহান গুণে ভূষিত করেছিলেন, তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা অন্ধ তাক্বলীদে জড়িয়ে পড়েছে এবং সে অনুযায়ী আমল করছে- অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ফলে পরিস্থিতি এমনই ঘোলাটে হয়ে পড়েছে যে যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা উন্নত জনগোষ্ঠি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে সঠিক ইসলাম নির্বাচনে দিশেহারা হয়ে পড়বে। উছূল ও ফুরু'র (ইসলামের মৌলিক বিষয় ও তার শাখা প্রশাখার) ক্ষেত্রে কোন্ মাযহাবের কোন্ বইটি নির্ভরযোগ্য, তা নির্বাচন করতেও তার একই ঘটনা ঘটবে। ইসলাম যে একমাত্র খাঁটি দ্বীন অথবা মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সকল মাযহাবই যে প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস- তাকে একথা বুঝানোও আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। যেমন জাপানবাসীদের ঘটনা-যা ইতোপূর্বে আমরা দেখে এসেছি। আমরা মুসলমানরা যদি কুরআন ও নবী (ﷺ) প্রদর্শিত সুপথের উপর ঠিক থাকতাম, তাহলে বক্রতা ও কঠিনতা বিবর্জিত সহজ

ইসলামী দ্বীন এবং নির্ভেজাল ও বিশৃঙ্খলাহীন খাঁটি জীবন ব্যবস্থাকে আমরা সহজে বুঝতে পারতাম।

যখন আমরা ফক্বীহগণের উক্তি ও তার শাখা-প্রশাখা এবং তাদের মতবিরোধ ও তার কারণের দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা সার্বিকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ি। ফক্বীহগণের কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, প্রাপ্ত দলীলটি শক্তিশালী হলেও তার উপর আমল করা যাবেনা এবং সে অনুযায়ী ফত্ওয়া দেওয়া যাবেনা। এখন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয়- এমন হবে কেন? তিনি উত্তরে বলেন- অমুক লোক একথা বলে গেছেন। তাই আমরা সে দলীলের উপরে আমলও করতে পারবনা এবং ফত্ওয়াও দিতে পারব না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অসংখ্য মানুষ যাদের অধিকাংশের জীবনেতিহাসও আমরা জানি না, তাদের একজনের কথাই ছহীহ্ হাদীস বর্জনের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে, অথচ উম্মতের জন্য হাদীসটির উপরে আমলই সেক্ষেত্রে বেশী লাভজনক ছিল। আর এভাবেই তো দ্বীনের মূল উৎস (কুরআন-হাদীস) থেকে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ছি। অথচ আক্বীদাহ্ (ধর্মবিশ্বাস) ও ইবাদত সংক্রান্ত কোন সমাধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো নিকটে নেওয়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে এই আক্বীদাহ্ রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব যে, বিধান একমাত্র আল্লাহরই। অন্য কেউ বিধানদাতা হতে পারেনা। আমাদের আক্বীদাহ্কে এভাবে নিষ্কলুষ রাখতে পারলেই আমরা তাওহীদবাদী তথা আল্লাহর রেযামন্দি লাভের জন্য খাঁটি দ্বীনের পালনকারী হতে পারব- কুরআনে কারীমে আমাদেরকে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করবে না সে আল্লাহর সাথে শির্ককারী ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন "

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

অর্থ " অনুসৃতরা যখন অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে এবং আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক। আর তখনই অনুসারীরা বলবে- কতই না ভাল হত, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত; তাহলে আমরাও তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতাম না, যেমন তারা (এখন) আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখাবেন- যা তাদের আফসোসের কারণ হবে (সেদিন)। আর তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না। [সূরা আল-বাক্বারাহ ১৬৬-১৬৭]

জেনে রাখুন যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষের কথা ও মতের উপর লেগে থাকা মুক্বাল্লিদগণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি একটি কঠিন ধরনের ভূমিকম্প স্বরূপ। এ ভূমিকম্প তাদের জীবিত ও মৃত সকলের জন্য সমান তাদের তাক্বলীদ আক্বীদাহ্ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে হোক। কারণ এর প্রত্যেকটিই তো আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) থেকে গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কারো উক্তি ও মত গ্রহণযোগ্য নয়। বিভ্রান্তকারী ইমামগণ এরই অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণের প্রত্যেকেই তো গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদাত, তার উপর ভরসা করা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে গাইরে অহীর উপর নির্ভর করা থেকে নিষেধ করে গেছেন।

মুফাস্‌সিরগণের কেউ কেউ মনে করেন যে, এ ধরনের আয়াতগুলো শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হ্যাঁ, সত্যই তাদের কথা। তবে কুরআনের এ আয়াতগুলোর সাথে যে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই- একথা বুঝা ভুল হবে। যেহেতু মুফাস্‌সিরগণের মতে কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি ভীতি প্রদর্শনই মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে সামনে রেখে করা হয়েছে। বিধায় মুসলমানদের জন্য কুরআন থেকে উদ্দিষ্ট উপদেশ গ্রহণের কিছু থাকে না। আর সেজন্যই তো দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কুরআনের ওয়ায নছীহাতকে কাজে লাগাচ্ছে না এবং ভেবে নিয়েছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র হক্ব আদা না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই তা আখেরাতের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ বহু মুনাফেক ও কাফেরও তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে। অতএব মূলকথা এই যে, মুমিনরা যেন

উপদেশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। ফলে তারা সে সব কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে যা করার কারণে কাফেররা ধ্বংসের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু তাক্বলীদের নেতারা মুসলমান ও তাদের প্রভুর কিতাবের মধ্যে বাধ সেধেছে। তাদের ধারণানুযায়ী যাদের মাধ্যমে সুপথ পাওয়া যেত তারা সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; অমুক অমুক বিষয়ে তাঁরা যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তা অর্জন করা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়, বিধায় তাঁদের মত লোকও ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ছাহাবা-তাবেঈনদের মত নেককার পূর্বপুরুষেরা, অনুরূপভাবে ইমাম চতুষ্টয়ও এ ব্যাপারে একমত যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে দলীল না জানা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির জন্য কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করা জায়েয হবেনা। অতঃপর মুক্বাল্লিদ আলেমদের যুগ আসে-যারা মুফতীর (ফত্ওয়া দানকারীর) উক্তিকে সাধারণ লোকের জন্য দলীলের (কুরআন-হাদীসের) পর্যায়ভুক্ত করে তোলে। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা এসে তাক্বলীদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়- তারা মানুষকে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি যে কোন ধরনের বিধান গ্রহণ করতে নিষেধ করে। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীস বুঝে সে অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করে, তাকে তারা ঔদ্ধত্যবাদী হিসেবে গণ্য করে। একেই তো অপমানের শেষ পর্যায় এবং দ্বীনের ক্ষতির ও শত্রুতার চূড়ান্ত সীমা বলা হয়। তারপরও জনগণ তাদেরকে অনুসরণ করে। ফলে তারা (অনুসৃতরা) আল্লাহর স্থলে তাদের (অনুসারীদের) মাবুদে পরিণত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে অচিরেই (ক্বিয়ামতের দিন) এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।

আমি দুর্বল বান্দা এ আয়াতকে কেন্দ্র করে একটি পুস্তক রচনা করেছি- যার নাম হচ্ছে "আল বুরহানুস্ সাত্বে' ফী তাবাররুয়িল মাত্বূয়ি মিনাত্ তাবে"। আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যে বইটি মিশর দেশে ছাপা হয়েছে। আপনি সেটার কপি সংগ্রহের চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাকে এবং হে হক্বের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, আপনাকেও সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করুন।

আলেমদের হাতে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের পরিবর্তন সাধন- প্রসঙ্গে ইমাম ফাখরুর্ রাযীর কিছু কথা

ইতোপূর্বে যে অর্থগত, শব্দগত ও অবস্থানগত বিচ্যুতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, অতীত যুগের তারই অনুরূপ কিছু ঘটনা আপনার জন্য আমি এখানে উল্লেখ করার ইচ্ছে পোষণ করছি। ইমাম ফাখ্রুদ্দীন রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ "মাফাতীহুল গায়ব" এ মহান আল্লাহর বাণী "

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ﴾

অর্থ " তারা নিজেদের পাদ্রী ও দরবেশদেরকে আল্লাহর স্থলে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা তাওবাহ ৩১]

এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনুরূপ কথা মহিয়ুস্ সুন্নাহ আলবাগাবীও (রহ.) "মায়ালিমুত্ তানযীল" গ্রন্থে উল্লেখ করেন : মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণের একটি জামাআতের সামনে কিছু মাসয়ালার উপরে আমি কুরআনের অনেকগুলো আয়াত পাঠ করি। আয়াতগুলো তাদের মাযহাব বিরোধী হওয়ার জন্য আয়াতগুলোর প্রতি তারা নযর দেয় না এবং ক্ববুলও করেনা। আর আমার দিকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। অর্থাৎ তাদের পূর্বসুরীদের থেকে এর বিপরীত বর্ণনা আছে- যার ফলে তাদের পক্ষে এ আয়াতগুলোর প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হচ্ছেনা। (এটা একটা তাক্বলীদ জনিত রোগ)। আপনি ভালভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, এ রোগ দুনিয়াবাসীর অধিকাংশের রক্তের সাথে মিশে প্রবাহিত হচ্ছে।

তাদের অনেকেই স্বীয় পীর মাশায়েখের মধ্যে আল্লাহর প্রবিষ্ট থাকার আক্বীদাহ্ পোষণ করে।[১৪] এ উম্মতের মধ্যে এ রকম আক্বীদাহর দাবীদারের অভাব নেই। ইমাম রাযীর কথা এখানেই শেষ হল। তিনি (রহ.) ৬০৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

[১৪] হুলুল ও উহদাতুল ওজূদ এ বিশ্বাসকে উম্মাতের আলিমগণ কুফুরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ, এটি ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত। যাকে সুনির্দিষ্ট করে আল-কুরআনে কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত।

এখান থেকে এই যুগের মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যারা অজ্ঞতা বশত" ওয়ারেছ সূত্রে প্রাপ্ত মাযহাবের পীর ইমামদের আক্বীদাহ্ ও হালাল-হারাম সব কিছুতেই, তাক্বলীদ করে চলেছেন। এ মর্মে (অর্থাৎ তাক্বলীদের পক্ষে) কোন কুরআনী অকাট্য দলীলও নেই; রাসূলের (ﷺ) এমন কোন হাদীসও নেই যা বরাবর অনুসৃত ও আমল হয়ে আসছে এবং প্রকাশ্য অর্থবহ কোন ছহীহ্ হাদীসও নেই। অধিকন্তু তাক্বলীদের মাধ্যমে এসবের বিরোধিতা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে ইমামগণের নীতিমালারও বিরোধিতা করা হচ্ছে। বরং ইমাম রাযী যাদের কথা উল্লেখ করেছেন- তাদের থেকে বহু নিকৃষ্ট লোক এযুগেই বসবাস করছে। এ সম্পর্কে শায়খ সাইয়েদ রাশীদ রেযা "আলমানার" তাফসীরে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আমি দুর্বল বান্দা আমার প্রণীত উম্মুল কুরআনের তাফসীর "আওযাদুল বায়ান ফী তাফসীরে উম্মিল কুরআন" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি মক্কা মুকাররামার উম্মুল কুরা প্রেসে ১৩৫৭ হিজরী সনে মুদ্রিত হয়েছে। সেটার কপি আপনি সংগ্রহ করুন।

রাসূলই (ﷺ) ইমাম 'আযম- অন্য কেউ না

"আল ইহইয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুরতাযা যুবায়দী বলেন " জেনে রাখুন যে, শরীয়তের ধারক ও বাহক প্রিয় নেতা মুহাম্মাদই (ﷺ) একমাত্র মুক্বাল্লাদ তথা অন্ধভাবে অনুসৃত হওয়ার যোগ্য। তাঁর সকল আদেশ ও কথা অন্ধের মত মেনে নিতে হবে। আর ছাহাবীদের তাক্বলীদ এজন্যই করা যাবে যে, তাদের কর্মই প্রমাণ করে যে, তারা রাসূল (ﷺ) থেকে তা শুনেছেন। আর তাঁরই তো অনুসরণের নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ইবনে আব্বাসের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কথা থেকে। তিনি বলেনঃ

ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ﷺ

قال العراقي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وكذا في قوت القلوب الخز

"প্রত্যেকেরই ইলমের কিছু গ্রহণীয় ও কিছু বর্জনীয় হতে পারে। তবে রাসূলের (ﷺ) ইলমের কিছুই বর্জনীয় নয়। ইরাকী বলেন- এ হাদীসটি ত্বাবারানী হাসান সনদে স্বীয় গ্রন্থ "আল মু'জামুল কাবীর" এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে "কূতুল ক্বলূব" -এও বর্ণিত আছে।

অতএব মাযহাবী তাক্বলীদ এমন এক ভয়াবহ রোগে পরিণত হয়েছে- যার পৃথিবীতে ঔষধ নেই, বিরাট বিপদে পরিণত হয়েছে- যা সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে। কাজে কুরআন-হাদীসের ছহীহ শরীয়তকে নিজেদের রচিত কিতাব ও পীর-মাশায়েখের উক্তির উপর প্রাধান্য দিতে খুব কম লোককেই আমরা দেখছি। তারপরও এখন আমরা তাওহীদবাদী খাঁটি দ্বীনের অনুসারীদের একটি জামাত দেখতে পাচ্ছি- সে জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। তাঁরা মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করছে, আল্লাহর পথে যথার্থ জিহাদ করে চলেছেন এবং তাক্বলীদপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন দজ্জালদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে তারা সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদেরকে হেজায, মিশর, সুদান, ইরাকের সান্‌জার প্রদেশ ও অন্যান্য দেশে দেখতে পাবেন।[১৫] আল্লাহ তুমি তাঁদেরকে আরো অধিক তাওফীক দাও- তারা যে যাবৎ তোমার দ্বীনের সাহায্য করে-তুমি তাদেরকে সাহায্য কর। হে বিশ্বজগতের রব্ব- এ প্রার্থনা ক্ববূল কর।

সাইয়েদ ছিদ্দীক্ব হাসান স্বীয় তাফ্‌সীর "ফাত্‌হুল বায়ান ফী মাক্বাছেদিল কুরআন" গ্রন্থে ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- যার বুঝার মত অন্তর আছে অথবা যে ব্যক্তি উপস্থিত অন্তঃকরণে (হক্বের কথা) শুনে, তার নিকট আল্লাহর দ্বীনে তাক্বলীদের কোন স্থান নেই এবং কুরআন-হাদীসের উপরে

[১৫] পাক-ভারতে ঐ সকল সংস্কারকদের নাম "আহলে হাদীস", মিশর ও সুদানে "আনসারুস সুন্নাহ" শাম দেশে "সালাফী"।

আলেমদের উক্তিকে সে কখনো প্রাধান্য দিতে পারেনা। কারণ- মূল দলীলসমূহ যার মাধ্যমে আল্লাহর হুজ্জত ও প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়-তার বিরোধিতা করে মাযহাবী ব্যক্তি এ উম্মতের কোন আলেমের আনুগত্য করে, তার উক্তি মেনে চলে। তার এই আনুগত্য ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের নিজ পাদ্রী দরবেশদের আনুগত্যের অনুরূপ। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের এ আনুগত্যকে কুরআনের ভাষায় ইবাদত বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজ পাদ্রী দরবেশদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে বলা হয়েছে। অথচ অকাট্যভাবে জানা গেছে যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি- অর্থাৎ তাদেরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেনি, বরং শুধু তারা তাদের আনুগত্যই করেছিল। তারা (পাদ্রী দরবেশরা) তাদের জন্য যা হারাম করেছিল - তাই তাদের নিকট হারাম ছিল এবং যা হালাল করেছিল- তাই হালাল ছিল। আর এ উম্মতের মুক্বাল্লিদরাও ঠিক এ কাজই করে থাকে। একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের যে সাদৃশ্য এবং একটি খেজুরের সাথে অন্য খেজুরের যে সাদৃশ্য, তার চেয়ে অধিক বেশী সাদৃশ্য রয়েছে মুক্বাল্লিদগণের ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের সাথে। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, হে রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্‌র (ﷺ) অনুসারীরা, আপনাদের কী হয়ে গেল যে, আপনারা কুরআন হাদীসকে এক কিনারে রেখে দিয়ে আপনাদের মত মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন? তাদের মতামতকে অনুসরণ করে চলেছেন? অথচ তাদের কেউই তো নিষ্পাপ নয়। তাদের সিদ্ধান্ত কখনো ঠিক হয় এবং কখনো বেঠিকও হয়- একথা তো আপনাদের আক্বীদাহ্‌র কিতাব সমূহে স্বীকৃত আছে। তারপরও মস্তিষ্কের এ দুর্বলতা, বোধশক্তির এ রুগ্নতা এবং বিবেকের এ কমজোরী কেন? অতএব হে ভাইগণ, আল্লাহ আপনাদের সুপথের দিশা দিন- অনিষ্পাপের লেখা বইগুলো ছাড়ুন এবং আপনাদের চিরঞ্জীব চির বিদ্যমান রব্বের কিতাবের দিকে ও নিষ্পাপ রাসূল মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাতের দিকে ফিরে আসুন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিনি তো ইমামদের ইমাম, তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করুন। সকল ইমাম তাঁরই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, অতএব তাঁর মাযহাবকে

http://www.shorolpoth.com

মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরই অনুসারী হোন। সুতরাং তাঁর মাযহাবের বিপরীত সকল মাযহাবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও বাত্বিল। হে আল্লাহ, আমাদের সঠিক (মাযহাবের) দিকে সুপথ দেখান।

কুরআনের অরহিত অকাট্য অর্থবহ বহু আয়াত দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ হচ্ছেন শরীয়তে একচ্ছত্র মালিক আর রাসূল (ﷺ) তাঁর পক্ষ থেকে শরীয়তের প্রচারক মাত্র। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন–

﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾

অর্থ ঃ "আপনার উপর শুধু প্রচারেরই দায়িত্ব রয়েছে।" [সূরা শুরা ৪৮]

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾

অর্থ "রাসূল (ﷺ)-এর উপরে শুধু প্রচারেরই দায়িত্ব রয়েছে।" [সূরা আল-মায়িদাহ ৯৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ﴾

অর্থ ঃ "আপনার উপর শুধু প্রচারেরই দায়িত্ব রয়েছে।" (আলু ইমরান ২০]

কুরআনের নছ্ (মূল দলীল) বা রাসূলের (ﷺ) বর্ণিত হাদীস থেকে প্রাপ্ত দ্বীনের রুকন হচ্ছে তিনটি। প্রথমটি হচ্ছে আক্বীদাহ বা ধর্ম বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- সর্বপ্রকারের ইবাদত– তা সাধারণ হোক কিংবা সময়, স্থান বা ধরন ও সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হোক। তৃতীয়টি হচ্ছে দ্বীনী হারাম। এছাড়া যে ক্ষেত্রে কোন মূল দলীল (কুরআন হাদীস) নেই সেক্ষেত্রে "কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অনাচারের অপসারণ" নীতির উপর নির্ভর করে ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীঈ অন্যান্য বিধানগুলো সাব্যস্ত করতে হবে। কাজেই ভেবে দেখুন এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের দলীল এবং সালাফে ছালেহদের আমল ও কথা বহু রয়েছে।

আমরা মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীস বুঝে তদনুযায়ী হেদায়াত গ্রহণের আহ্বান জানানোর জন্য বহু দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। সেগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামী ইমামগণের কথার নমুনাও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। অতএব কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইবাদত ও যিক্র সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুন। অতিরঞ্জন, গোঁড়ামি ও কৃত্রিমতা (নিজের সৃষ্ট কষ্ট) ছাড়াই কুরআন হাদীসকে মূল সম্বল হিসেবে গ্রহণ করুন। অন্য কিছুর ধারে কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। এরপর ফরযে কিফায়াতে অংশ গ্রহণ করুন- যেমন ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; নিপীড়িত, নির্যাতিত ও জিম্মিদেরকে মুক্ত করা, সঠিক নিয়মানুযায়ী শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় জান মাল দ্বারা ইসলামী উম্মতকে শক্তিশালী করা; আল্লাহর পথে মাল ব্যয় করা ইত্যাদি। এসব কাজ বিদআতী যিক্র-আয্কার থেকে অনেক উত্তম।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ জগতে ছেরাত্বে মুস্তাক্বীমের উপর চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সে আদেশ পৌঁছে দিতে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, এটাই ছেরাত্বে মুস্তাক্বীম-যার উপর চললে জান্নাত তথা পুরস্কারের জগতে পৌঁছা যাবে। এ জগতে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে যে ছেরাত্বের উপর চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন- তারই উপরে যে বান্দা যে পরিমাণ অবিচল থাকতে পারবে জাহান্নামের পিঠের উপর পাতানো ছেরাত্বের (পুলছেরাত্বে) উপরেও সেই বান্দার পা সে পরিমাণই স্থির বা অবিচল থাকবে।

আর এজন্যই মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ ঃ "নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ (ছেরাতে মুস্তাক্বীম)। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না, অন্যথা সে পথগুলো তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তোমাদেরকে (তোমাদের প্রভু) এ নির্দেশই দিয়েছেন। যেন তোমরা আল্লাহ ভীরু হও।" [সূরা আন'আম ১৫৩]

যেহেতু ছেরাত্বে মুস্তাক্বীমের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এমন একটি বিষয়ের অনুসন্ধান করছে-যার প্রতি অধিকাংশ মানুষই অনীহা প্রকাশ করছে। ফলে এর পথিক একাকী হওয়ার জন্য কখনো কখনো নির্জনতাও অনুভব করতে পারে - সেজন্য আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ পথেও সঙ্গী আছে। এ সঙ্গীরা হচ্ছেন আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। আর সঙ্গী হিসেবে এরা কতইনা উত্তম। যাতে করে হেদায়াতের অনুসন্ধিৎসু ছেরাত্বে মুস্তাক্বীমের পথিকের অন্তরে স্বজাতি ও যুগের লোককে নিজ পথে না পাওয়া থেকে সৃষ্ট নির্জনতা ও একাকিত্বের অবসান ঘটে এবং সাথে সাথে তাঁর একথাও যেন জানা হয়ে যায় যে, এ পথের সঙ্গীদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এ পথের প্রতি অনীহা প্রকাশকারীর আচরণে সে মোটেও চিন্তিত হবে না। বরং ধারণা রাখবে যে, তারা সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও মান সম্মান তো তাদের খুবই কম। অনুরূপ কথা জনৈক পূর্বপুরুষ বলেছেন- হক্ব পথে চল; এ পথের পথিকের সংখ্যা কম দেখে নির্জনতা অনুভব করো না; সাবধান! বাত্বিল পথ থেকে দূরে থাক; বাত্বিল পথে চলার জন্য যারা ধ্বংস হবে-তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারিত হয়ো না; আর যখনই তুমি একাকী হওয়ার কারণে নির্জনতা অনুভব করবে, তখন পূর্ববর্তীদের (সঙ্গীদের) দিকে নযর দাও; তাদের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে; অন্যদের প্রতি মোটেই দৃষ্টি দিওনা। কারণ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে তারা তোমার কোনই উপকারে আসবে না। চলার পথে তোমাকে তারা ডাকলে তুমি তাদের দিকে দৃকপাত করোনা। কারণ যখনই তুমি তাদের দিকে দৃকপাত করবে-তখনই তারা তোমাকে পাকড়াও করবে, তোমাকে বাধা দিবে। সেজন্যই তো দুওয়ায়ে কুনূতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে-

[اللهم اهدني فيمن هديت أي أدخلني في زمرة الرفقة وجعلني رفيقا لهم ومعهم]

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়াত দান করেছ- তাদের অন্তর্ভুক্ত করে তুমি আমাকে হেদায়াত দান কর) অর্থাৎ, তুমি আমাকে

হিদায়াতপ্রাপ্ত সঙ্গীদের দলভুক্ত কর, আমাকে তাদের সঙ্গী বানিয়ে দাও এবং তাদের সাথে করে দাও।

যাদের উপর (আল্লাহর) গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে-তাদের মাযহাব থেকে প্রত্যেক বান্দারই দূরে থাকা উচিত। যারা গযবের পাত্রে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহুদীরা বিকৃত ইলম ও মনোবৃত্তির অনুসারী, তারা হক্ব চিনেও তা থেকে সরে পড়েছে। আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রীষ্টানরা। এদের ইলম বিগড়ে যাওয়ায় এরা হক্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে গেছে এবং হক্বকে চিনতেই পারেনি। আর হক্ব হচ্ছে তাই-যার উপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ ছিলেন। মানুষের মতামত, চিন্তা-চেতনা, পরিভাষা ও পরিস্থিতি কোনদিন হক্ব নয়। অতএব প্রত্যেকটি ইলম, আমল, বাস্তবতা, অবস্থা ও অবস্থান যার উৎস হচ্ছে নবুওয়াতী চেরাগদানী এবং যা মুহাম্মদী রেলপথে অবস্থিত, তাই হচ্ছে ছেরাত্বে মুস্তাক্বীম। আর যা সিরাতে মুস্তাক্বীমের অন্তর্ভুক্ত নয়-তাই হচ্ছে গযব, ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামবাসীদের পথ। অনুরূপ কথা ইবনুল ক্বাইয়েমের "মাদারিজুস্ সালেকীন" গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বীন তথা রাসূলের (ﷺ) আনীত শরীয়তের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ছাহাবীগণই অন্যদের থেকে অধিক বেশী জানতেন-এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর একথা আদৌ সম্ভব হতে পারে না যে, ছাহাবীগণ হক্ব চিনতে পারেন নেই অথচ রাফেযী বেদআতীরাই হক্ব চিনতে পেরেছে। আমরা যদি উভয় দলের স্মৃতি চিহ্ন লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে, হক্বপন্থীদের পথ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। রাসূলের (ﷺ) ছাহাবীগণ কাফেরদের দেশ জয় করে ইসলামের দেশে পরিণত করেছেন; কুরআন, ইলম ও হেদায়াত দ্বারা তাঁরা মানুষের অন্তরকে জয় করেছেন। কাজেই তাঁদের স্মৃতিচিহ্নই ইঙ্গিত বহন করে যে, তাঁরা (ছাহাবীরা) ছেরাত্বে মুস্তাক্বীমের উপর জীবন যাপন করেছেন। পক্ষান্তরে রাফেযী, বিদআতী ও নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারীদের সর্বযুগে ও সর্বকালে এর বিপরীত দেখতে পাই।

১৩৬০ হিজরী সনের রামাযানের দশম তারিখে জুমআর দিন ত্বায়েফে অবস্থিত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের মসজিদে বসে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কিতাব (আল কুরআন) পাঠ করছিলাম। উক্ত তেলাওয়াত থেকে হঠাৎ আমার বুঝে আসে যে ফির'আউনই (তার উপর আল্লাহর লানত হোক) লোকদেরকে দলে দলে বিভক্ত করেছিল এবং বিভিন্ন মাযহাব ও ত্বরীকা সৃষ্টি করে তাদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। অতএব এখান থেকে জানা গেল যে, মাযহাব তৈরি ও পালনের বিদআত ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ ত্বরীকা ফির'আউনেরই রেখে যাওয়া একটি সুন্নাত তথা তার খবীছী রাজনীতি। বর্তমানে তা ইউরোপীয় ইবলীসী সরকারের রাজনীতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ”

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ﴾

অর্থ ঃ ফির'আউন নিজ দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে– তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। [সূরা ক্বাছাছ ৪]

জেনে রাখুন যে, কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই সকল নবীর (আঃ) প্রতি ঈমান আনা, তাদের শরীয়ত মেনে নেয়া এবং হক্বের অনুসরণ সহ তাদের (নবীদেরকে) যথোপযুক্ত সম্মান করা সুপথ প্রাপ্তদেরই বৈশিষ্ট্য এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং নবীদের সম্মান করা যেমন হেদায়াতপ্রাপ্তদের ছিফত বা বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে তাদের ওয়ারেছগণেরও সম্মান করা হেদায়াতপ্রাপ্তদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের উপরে এটা ওয়াজিবও। আর নবীদের ওয়ারেছগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন- ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ, ইমাম চতুষ্টয় ও তাদের মত মুজতাহিদ ইমামগণ এবং হাদীসের অনুসারীদের ইমামগণও। অতএব তাদের একজনের কথা গ্রহণ করে বাকী সকলের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা-হেদায়াত প্রাপ্তদের আচরণ হতে পারেনা এবং মুত্তাক্বীদের (আল্লাহ ভীরুদের) ছিফতও হতে পারে না। কিন্তু (দুঃখজনক হলেও সত্য যে) জড়তাচ্ছন্ন মাযহাবী

মুকাল্লিদদের অধিকাংশ লোকই উক্ত কাজটি করে থাকে। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মাযহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-যার জের হিসেবে তারা ফরয ছলাতেও অন্য মাযহাবের ইমামের ইক্তেদা করে না। সুতরাং তাদের মূর্খতা থেকে (মাযহাবী) গোঁড়ামির সৃষ্টি-যা তাদের অন্তর ও চক্ষু সবকিছুকে অন্ধ করে দিয়েছে।

পথভ্রষ্টদের কেউ কেউ মাযহাবকে আছল (মূল) স্থির করেছে। আর আল-কুরআনকে তারই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে তথা তাবীল (অপব্যাখ্যা) ও তাহরীফের (অর্থগত বিকৃতির) মাধ্যমে মাযহাবের অনুকূলে করে ফেলেছে। এহেন কাজ করে চলেছে একদল লাঞ্ছিত লোক। আর পথভ্রষ্টরা দিকদিশা সবকিছু হারিয়ে তাতেই হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ অপরিহার্য হক্ব ছিল এই যে, আল কুরআন হবে আছল (মূল)। আর তারই দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনী সকল মতামত ও মাযহাবকে বিচার করতে হবে। কুরআনের সাথে যা মিলে- তা গ্রহণ করতে হবে আর যা কুরআন বিরোধী- তা বর্জন করতে হবে।

ক্রোধভাজনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে- তারা নিজ দল ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হক্ব গ্রহণ করবে না–

জেনে রাখুন যে, ক্রোধভাজনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে- তারা স্ব মাযহাবী ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হক্ব গ্রহণ করবে না– যদিও তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী হয়, তবুও অনুসরণ করে না। ফেক্বহী বা ছুফীদলের দ্বীন, ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অনেক লোকেরই অবস্থা এই। কারণ, তারা নিজ দলীয় লোকদের থেকে প্রাপ্ত মত বা বর্ণনা ছাড়া দ্বীনের অন্য কোন মত বা বর্ণনা কখনো গ্রহণ করেনা। অথচ দ্বীন ইসলাম সাধারণভাবে হক্বের অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছে এবং রাসূল (ﷺ) ছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করেনি যে, শুধু তারই বর্ণনা কিংবা নিকট থেকে হক্ব গ্রহণ করতে হবে-অন্য কারো নিকট থেকে হক্ব গ্রহণ করা যাবে না। কেননা হক্ব বা হিকমাত হচ্ছে মুমিনের হারানো বস্তুর ন্যায়। তিনি যেখানেই তা পাবেন, সেখান থেকেই তা গ্রহণ করবেন।

কারণ কথিত আছে,

[الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها]

মাযহাবী ব্যক্তির অন্তরে কোন ব্যক্তি বিশেষ বড় হিসাবে স্থান পায়, ফলে বাপ-দাদা ও দেশবাসীর রীতি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির সমস্ত কথাই সে বিনা চিন্তা ভাবনায় গ্রহণ করে থাকে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভ্রষ্টতা। কারণ- দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল কথার প্রতি, তার প্রবক্তার প্রতি নয়। যেমন- আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হক্ব মানুষের মাধ্যমে চিনা যায় না; বরং হক্বকেই চিনো, তাহলে হক্বপন্থীকে চিনতে পারবে। অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করতে বলেছেন ও করেছেন এবং ছাহাবীগণ (রা) যা করেছেন তারই অনুসরণের মধ্যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত। অনুরূপভাবে সালাফে ছালেহীনের (নেককার পূর্বপুরুষদের) অনুসরণও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে দ্বীনী বিষয়ে পরবর্তীরা যা আবিষ্কার করেছে, তারই মধ্যে রয়েছে সার্বিক অনিষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। আর মাযহাবও যে দ্বীনের মধ্যে তদ্রূপ একটি নবাবিষ্কার বা বিদআত- এতে কোন সন্দেহ নেই। এ মাযহাবের আবিষ্কারক হচ্ছে শাসকগোষ্ঠী ও রাজা বাদশাহগণ। তারা এটা নিজেদের রাজনীতির চাহিদা পূরণার্থে কিংবা খেয়াল খুশীর অনুসরণে বা নিজেদের মর্যাদা রক্ষায় বা শায়খদের (পীরদের) অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বনের উদ্দেশ্যে করেছে- একথা প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই জানা আছে।

ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী "আত্‌তাফ্‌হীমাত" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় বলেন- বিশেষ করে এ যুগের জনসাধারণকে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে কোন না কোন মাযহাবেরই অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে। কেউ যদি একটি মাসয়ালাতেও মুক্বাল্লাদ ইমামের মাযহাবের বাইরে চলে যায় - তাহলে তাকে তারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করছে। তাদের এহেন আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, মুক্বাল্লাদ (অন্ধভাবে অনুসৃত) ইমামকে যেন তাদের নিকট নবী করে পাঠানো হয়েছিল। যার ফলে তার অন্ধ অনুসরণ করা তাদের উপর ফরয হয়ে পড়েছে। অথচ চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বের লোকেরা যাদেরকে উম্মতের প্রথম যুগের বা উত্তম যুগের লোক বলা হয়- তাঁরা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন না।

"কূতুল কুলূব" গ্রন্থে আবু ত্বালেব মাক্কী বলেন- (ফেক্বহের) কিতাবসমূহ ও দল (মাযহাব) গুলো নতুন জিনিস (বিদআত)। মানুষের উক্তিসমূহ গ্রহণ, একজন ব্যক্তির মাযহাব অনুসারে ফত্‌ওয়া প্রদান এবং সর্ববিষয়ে তারই উক্তি গ্রহণ ও তারই মাযহাবের উপরে জ্ঞানার্জন- এ কাজগুলো আগের যুগের মানুষেরা করতেন না। বরং জনসাধারণ আলেমদেরকে যেখানে পেতেন, (সম্ভব হলে) সেখানে গিয়েই তাদের থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আর যে ব্যক্তি কোন হাদীস শুনে নিলেন, তিনি সেই হাদীসের উপরেই আমল করতেন এবং হাদীস ছাড়া অন্য কিছুর তাক্বলীদ করতেন না। তাঁরা শরীয়তের বা হক্বেরই শুধু তাক্বলীদ করতেন। পরস্পর বিরোধী বর্ণনা (হাদীস) পাওয়া গেলে যেটার প্রতি অন্তরে স্বস্তি বোধ হয় সেটার অনুসরণ করতেন। জনসাধারণের মত বিরোধ এড়াবার জন্য কেউ কেউ আবার নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে চলা পছন্দ করতেন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত আলেমগণের কেউ আবার নিজ আমল কিংবা অপরকে ফত্‌ওয়া প্রদানের সময়ও কোন নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে চলতেন না। যেমন আবু মুহাম্মাদ আল জুওয়াইনী। তিনি "আলমুহীত" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি কোন নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে চলেননি। এ মাসয়ালাতেই জাতি ভীত সন্ত্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর সৃষ্টি হয়েছে বিবিধ ফেৎনা ও পক্ষপাত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য করেননি–এটাই হক্ব কথা

হক্ব কথা এই যে, শরীয়তের প্রচারক (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামগণের কারোর মাযহাব নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করতে কোন মানুষকে বাধ্য করেননি। বস্তুত" তিনি তাঁরই অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুসাব্যস্ত সুন্নাতের (হাদীসের) বিরোধিতা করবে, তার বিরোধিতার গুনাহ্ তার উপর বর্তাবে (মুক্বাল্লাদ ইমামের উপর নয়) এবং কখনো তার ওযর থাকলে-হাদীসটি পৌছা পর্যন্ত তার

ওযর গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি হাদীসের উপর আমল করব না, বরং আমি আমার ইমামের কথার উপর আমল করব এ ধরনের কথা ইসলামের কোন দাবীদারের মুখ থেকে বের হওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এরকম কথা তাকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বানিয়ে ফেলবে। এহেন কথা বলা থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

সুতরাং মুসলিমের ওয়াজিব হবে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত সবকিছুকে গভীরভাবে দেখা, মাথা পেতে মেনে নেয়া, শক্ত করে কামড়ে ধরা তথা অন্তর ও হস্তের সমন্বয়ে মজবুত করে আঁকড়ে ধরা এবং হাদীস বিরোধী কোন কথা না শুনা। এ মধ্যবর্তী রাজপথটিকে আপনি একক মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করুন এবং এ থেকে বের হবেন না। (উদাহরণ হিসেবে) এ রাজপথের বহির্ভূত বিষয় হচ্ছে- ওযুতে দু' পা (ধৌত করার পরিবর্তে) মসেহ্ করা, নেকাহে মুতা'কে হালাল জানা, অল্প পান করলে যে মদ মাতাল করে দেয়- তা হালাল মনে করা, গৃহপালিত গাধার গোস্ত হালাল মনে করা, যোহরের সময় শেষ হয় বস্তুর প্রকৃত ছায়া বাদে ছায়া যখন তার দ্বিগুণ হয় তখন- এ মত পোষণ করা।

অতঃপর হে মুসলিম, ইলমে যদি আপনার উন্নত লক্ষ্য থাকে এবং আল্লাহ ভীতির ক্ষেত্রে যদি আপনার দৃঢ় সংকল্প থাকে, তাহলে আপনি কুরআনের উন্মুক্ত কথা ও হাদীসের প্রকাশ্য ভাষা এবং সালাফ্দের (ছাহাবী, তাবীঈদের) অধিকাংশ আলেমের কার্য বুঝার জন্য আগ্রহী হোন। মুহাদ্দিছদের রচিত গ্রন্থে বর্ণিত ছহীহ্ ও হাসান হাদীসগুলো খুঁজে বের করে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করুন। আর গ্রহণ করুন সেটা, যেটা আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী মজবুত, সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল ও সবচেয়ে বেশী সাবধানতাপূর্ণ মনে হয়নি এ ত্বরীকা অর্জন করা খুব সহজ। মুওয়াত্তা, ছহীহাইন, সুনানে আবী দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ- এ ছয় হাদীস গ্রন্থের থেকে বেশী গ্রন্থের আপনার দরকার হবে না। এ গ্রন্থগুলো খুবই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আপনি এগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। সুতরাং আপনি এগুলো সংগ্রহ করে শিখার চেষ্টা করুন। এখন আপনার যদি সে ক্ষমতা

না থাকে, কিন্তু আপনার সহ ভাষা-ভাষী কোন ভাই তা জেনে আপনাকে আপনার নিজ ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়- তারপর সেটাকে যদি আপনি ক্বূল করেন-তাহলে (আল্লাহর নিকট) পেশ করার মত কোন ওযর আপনার আর বাক্বী থাকছেনা। মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

"আত্তাফ্হীমাত" প্রথম খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, যারা নিজেদেরকে তাক্বলীদের উপর লেগে থাকা ফক্বীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করছে- তাদের নিকট ছহীহ্ সনদে রাসূলের (ﷺ) কোন হাদীস পৌঁছলেও তারা তার উপর আমল করে না, যদিও পূর্ববর্তী ফক্বীহগণের একটি বিরাট দল সেই হাদীসটির উপর আমল করে গেছেন। হাদীসটির উপর আমল করেননি যে ইমাম, শুধু তারই তাক্বলীদ তাদেরকে হাদীসটির উপর আমল করতে বাধা দিচ্ছে। অতএব এ তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ্ দলের লোকেরা সবাই দুর্বলতা ও মূর্খতাপূর্ণ মত ও ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে। আর বাস্তব কথা এই যে, হক্ব সুস্পষ্ট। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহ্কেই সাক্ষী মানছি তিনি তো বরকতময়, মহান, সবার থেকে বেশী সম্মানিত ও বেশী ন্যায়বান। তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে শরীয়তের উপর মানুষকে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই শরীয়ত বুঝতে মানুষ অপারগ হবে, সে শরীয়তের হক্ব-বাত্বেলের মধ্যে মানুষ পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবে- এমনটি কখনো তিনি করতে পারেন না। বরং আল্লাহ তাবারাক ও তা'আলা হক্বকে এমনভাবে সমুজ্জ্বল ও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, অতীব সীমালংঘনকারী ও চরম ধরনের দুষ্ট ছাড়া আর কেউ ধ্বংসের পাত্রে পরিণত হবে না। তিনি তো সুদৃঢ় কিতাব নাযিল করেছেন- যার ভাষা মানুষের কথার সাথে মিশ্রিত হওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই। সে কিতাবকে তিনি রদ-বদল থেকে রক্ষা করেছেন (যার ফলে তার একটি অক্ষরও বদলেনি); তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে তিনি বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁকে বিচারক বানিয়েছেন। রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসগুলোকে রক্ষার জন্য আমানতদার জিম্মাদারদের সৃষ্টি করেছেন- যাঁরা তাঁর হাদীসগুলো বর্ণনা করে হক্ব প্রকাশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা জাল

হাদীসগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কাজেই আপনার উচিত হবে ছেক্বাহ্ রাবীদের (ন্যায়পরায়ণ ও মুখস্থ শক্তিতে দৃঢ়দের) বর্ণিত ছহীহ ও হাসান হাদীসগুলো গ্রহণ করা এবং তারই উপর নির্ভর করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ছহীহ্ হাদীসের বিরোধিতা করবে, সে পথভ্রষ্ট জাহেল ছাড়া কিছুই নয়।

উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, আমি আল্লাহর নামে তাঁরই জন্য সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র বিধানদাতা এবং তাঁর বিধান ছাড়া (মানার যোগ্য) কোন বিধান নেই। আর মহান আল্লাহ্ ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ্, মাকরুহ ও হারাম- এ বিধানগুলো রিসালাতের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নাযিল করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি না জেনে না বুঝে বলে যে, এটা ওয়াজিব কিংবা হারাম, সে তাহলে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

অর্থ ঃ "তোমাদের মুখের মিথ্যা কথানুসারে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীরা (আখিরাতে) সফলকাম হবে না।"

[সূরা আন-নাহল ১১৬]

যার কথা ভুল শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে- এমন ধরনের উম্মতভুক্ত কোন লোকের অনুসরণ করা আল্লাহ মানুষের উপর ওয়াজিব করেছেন, বিধায় যে ব্যক্তিই যা ওয়াজিব করবে তাই হবে মানুষের উপরে ওয়াজিব - এহেন আক্বীদাহ্ (ধর্ম বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফুরী করেছে- এ মর্মে আমি আল্লাহর নামে-আল্লাহর জন্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি। কেননা হক্ব পরিপূর্ণ শরীয়ত সে লোকের সৃষ্টির (বহু) পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে শরীয়তকে আলেমগণ মুখস্থ করেছেন। বর্ণনাকারীগণ অপরের নিকট বর্ণনা করে তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং ফক্বীহ্গণ তারই মাধ্যমে বিধান সাব্যস্ত করেছেন। আলেমগণ রাসূলের (ﷺ) শরীয়তের বর্ণনাকারী, বিধায় জনগণ তাদের তাক্বলীদে ঐকমত্য পোষণ করেছে।

সুতরাং মুহাদ্দিছগণ যে হাদীসের ছহীহ হওয়ার সাক্ষ্য দেন এবং যে হাদীসের উপর বহু লোক আমল করে গেছেন, সে হাদীসের উপর কেউ যদি অনুসরণীয় ইমামের আমল নেই বলে আমল না করে-তাহলে এটাকেই সুদূর পথভ্রষ্টতা বলা হবে।

উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, আমি আল্লাহর জন্য তাঁরই নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, শরীয়তের স্তর দু'টি। একটি হচ্ছে ঃ মূল ফরযগুলোকে গ্রহণ করা, সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বর্জন করা এবং ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতিষ্ঠা করা। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, রাজা-বাদশাহ, মুজাহিদ, কৃষক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, গোলাম-স্বাধীন-সকল লোকের জন্য এ স্তরটি অবশ্য পালনীয় এবং অত্যন্ত সহজ ও সর্বপ্রকারের কঠিনতা মুক্ত। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে ঃ পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের স্তর। যে ব্যক্তি এটা পালন করবেন, তিনি সুন্নাতপন্থী সৎকর্মশীল আবেদ হিসেবে গণ্য হবেন। আর এ স্তরের কাজ হচ্ছে- রাসূল (ﷺ), উম্মতের প্রথম লোকগণ (ছাহাবা) এবং সৎকর্মশীল তাবেঈগণ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের সুন্নাত, শিষ্টাচার ও পরহেযগারীর কাজ। স্তরদ্বয়ের মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে- যা অস্বীকার করা ক্ষতি ও মূর্খতা। স্তরদ্বয়ের মধ্যেকার পার্থক্য না বুঝা থেকেই আলেমদের অধিকাংশ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। মুজাহিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এদের যারা রোজগারের কাজে ব্যস্ত থাকেন- তারা শুধু প্রথম স্তরটি পালন করবেন। আর যারা ইবাদত ও দ্বীনদারীর ময়দানে নেমেছেন-তাঁরা দ্বিতীয়টিও পালন করবেন। আর কিছু লোক এ দু' দলের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবেন। যারা রোজগারের কাজ করেন-বিশেষ করে দাস-দাসী, কৃষক ও পেশাজীবী এদেরকে প্রথম স্তরের অধিক কিছু করতে বলা মোটেই ঠিক হবে না। অন্যথা তাদের উপরে তা কঠিন হওয়ায় ছেড়ে পলায়ন করবেন। অতএব হে মানুষেরা, আপনারা তাঁরই অনুসরণ করুন– যে নিজের নাফ্স কিংবা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে আপনাদেরকে আহ্বান করে না। বরং আহ্বান করে শুধু আল্লাহর কিতাব ও তদীয় রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের দিকে।

উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, গ্রীক দর্শন, নাহু ছরফ (আরবী ব্যাকরণ) ও অলংকার শাস্ত্রের সাথে জড়িত থেকে অনেক বোকারা নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। অথচ তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের গুটি কতক শব্দ ছাড়া কিছুই জানে না। প্রকৃতপক্ষে তারা ফক্বীহ্দের ইস্তেহ্সান (জনগণের জন্য যা ভাল মনে করা হয়) ও আবিস্কার নিয়ে লিপ্ত থাকে। আর যখনই তাদের নিকট রাসূল (ﷺ)-এর কোন হাদীস পৌঁছে যার উপর তারা আমল করে না, তখন তারা বলে যে, আমরা তো অমুকের মাযহাব অনুসারে আমল করি, হাদীসের উপর নয়। আর আমাদের ইমাম হাদীস সম্পর্কে আমাদের থেকে বেশী জানতেন। অতএব হাদীসটির উপরে তাঁর আমল না করার পিছনে অবশ্যই কোন কারণ আছে। হাদীসটি তাঁর নিকট রহিত কিংবা অপ্রাধান্যযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তিনি হয়ত আমল করেননি। (কল্পনা প্রসূত) এহেন কথা ও কাজের দ্বীনের ভিতর কোন স্থান নেই যদি আপনারা নবী (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনে থাকেন, তাহলে আপনারা নবীরই অর্থাৎ তাঁর হাদীসেরই অনুসরণ করুন, তা আপনার ইমামের মাযহাবের স্বপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এই, সে প্রাথমিকভাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (ﷺ) হাদীসের সাথে জড়িত হবে। অতঃপর তারপক্ষে এতদুভয় থেকে দ্বীন গ্রহণ সহজ হলে- তা তার জন্য যথেষ্ট এবং খুবই উত্তম কথা। আর যদি অপারগ হয়, তাহলে সে বিগত আলেমদের বুঝ থেকে সহযোগিতা নিয়ে যা তার নযরে হক্ব, সঠিক ও হাদীসের মুতাবেক মনে হয়, তাই গ্রহণ করবে। আর যান্ত্রিক বিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত হবে না। তবে যন্ত্র হিসাবে ব্যস্ত হওয়া যায় কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বিদ্যা হিসেবে নয়।

উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, কোন মাস্য়ালাতে কোন ইমামের মুকাল্লেদের নিকট ইমামের কথার বিরোধী রাসূলের (ﷺ) হাদীস পৌঁছে। অতঃপর সে হাদীসখানা পরিত্যাগ করে

ইমামের কথাকে গ্রহণ করে নেয়– এহেন লোকের (আল্লাহর নিকট) কোন ওযর থাকতে পারেনা। উপরন্তু এটা মুসলমানের কাজও নয়। বরং এরূপ আচরণকারীর মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা কিছু দুর্বল মুসলমানকে দেখেছি যাদেরকে বেশভূষায় নেককার আলেম মনে হচ্ছিল- তারা আল্লাহর পরিবর্তে নেককারদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ক্ববরগুলোকে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মত মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। তাদের কিছু লোককে আল্লাহর কালামের অর্থগত বিচ্যুতিও ঘটাতে দেখেছি। প্রত্যেক দলের মধ্যে তাহ্রীফ (পরিবর্তন) ছড়িয়ে পড়েছে। ছূফীদের অনেক কথারই কুরআন-হাদীসের সাথে কোন মিল নেই। ফক্বীহদের অনেক আবিস্কারেরই প্রাপ্তিস্থান জানা যাচ্ছে না। ফলে জনসাধারণ (তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে) ত্বাগুতের ইবাদতকারীতে পরিণত হয়েছে এবং নেককারদের ক্ববরকে মসজিদ ও ঈদগাহে পরিণত করা ইত্যাদি ভ্রষ্টতার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

“এ'লামুল মুওয়াক্কেঈন” গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন- পরিচিত মাযহাবসমূহের কোন একটি মাযহাব গ্রহণ করা কি সাধারণ লোকের জন্য আবশ্যক না আবশ্যক নয়? এ মর্মে ছহীহ্ শুদ্ধ ও অকাট্য কথা এই যে, সাধারণ লোকের জন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) যা ওয়াজিব করেছেন, তাই ওয়াজিব– এছাড়া কোন ওয়াজিব নেই। আর আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) উম্মতের কোন ব্যক্তির (ইমামের) মাযহাবের অনুসরণ করা কারুর উপর ওয়াজিব করেননি যে, তাঁরই তাক্বলীদের মাধ্যমে দ্বীন পালন করবে। স্বর্ণযুগের লোকদের মাযহাবের সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না। সাধারণ লোকের জন্যও মাযহাব গ্রহণ ঠিক নয়। এখন কোন সাধারণ লোক যদি মাহযাব গ্রহণ করেই নেয়, তবুও তার কোন মাযহাব নেই। অতএব সে যখন বলবে যে, আমি শাফেঈ বা মালেকী বা হানাফী বা হাম্বলী ইত্যাদি, তখন মুখের কথাতেই সে তা হতে পারবে না। যেমন শুধু মুখের দাবীতেই কেউ ফক্বীহ্ বা নাহুবিদ বা লেখক হতে পারেনা। শাফেঈ বা মালেকী বা

হানাফী বা হাম্বলী ব'লে কোন ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবী কেউ করলে, তার দাবী তখনই সঠিক বলে গণ্য হবে যখন সে বিদ্যা-জ্ঞান ও দলীল সমূহের ক্ষেত্রে উক্ত ইমামের পথ অনুসরণ করবে। সুতরাং মূর্খতা এবং ইমামের চরিত্র, বিদ্যা ও পথ থেকে বহু দূরে অবস্থানের পর শুধু মৌখিক দাবী ও অর্থহীন কথার মাধ্যমে একজন সাধারণ ব্যক্তির কীভাবে ইমামের সাথে মাযহাবী সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দাবী ঠিক হতে পারে?

অতএব সাধারণ লোকের মাযহাব গ্রহণ সঠিক হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। (জোর করে) কল্পনা করা হলেও মাযহাব গ্রহণ করা তবুও তার জন্য আবশ্যক নয়, অন্যের জন্যও নয় এবং কারুর জন্যই নয় যে, সে উম্মতের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মাযহাবকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে যে, তার (ইমামের) সব কথাই সে গ্রহণ করবে এবং অন্যদের সব কথাই সে বর্জন করবে। মুসলিম জাতির মধ্যে সৃষ্ট এটি একটি ঘৃণ্য বিদআত। ইসলামের ইমামগণের কেউ এটি করতে বলেননি। তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে অনেক উচ্চ, সম্মানের দিক থেকে অনেক মহান এবং আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞাত- তাঁরা মানুষের উপর মাযহাব গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে পারেন না। আলেমদের কারুর মাযহাব গ্রহণ করতে হবে– একথা যে ব্যক্তি বলে, তার থেকে তাঁরা বহু দূরে এবং তার থেকেও তাঁরা বহু দূরে যে ব্যক্তি বলে যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের যে কোন একটি মাযহাব গ্রহণ করা আবশ্যক।

হায় আল্লাহ কী আশ্চর্য ব্যাপার! রাসূলের (ﷺ) ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং ইসলামের সকল ইমামগণের মাযহাবের মৃত্যু ঘটেছে, বহু সংখ্যক মাযহাব বাতি্বলও হয়ে গেছে; রয়ে গেছে শুধু সমস্ত ইমাম ফক্বীহগণের মধ্যেকার চার ব্যক্তির মাযহাব। কোন ইমাম কি মাযহাব গ্রহণের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন বা মাযহাব গ্রহণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন? না তাঁর মুখ থেকে এমন কোন শব্দ বের হয়েছে- যা মাযহাব গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে? আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের উপর যা পালন করা ওয়াজিব করেছেন, তাই ওয়াজিব করেছেন তাদেরও উপরে যারা তাদের (ছাহাবী,

তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের) পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দুনিয়ায় আগমন করবে। ওয়াজিব বিভিন্ন হবে না এবং পরিবর্তনও হবে না যদিও তার ধরণ ও পরিমাণ, সক্ষমতা ও অপারগতা, স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

নিজ ইমাম ব্যতীত অন্যের নিকট রাসূলের (ﷺ) হাদীস বা খলীফা চতুষ্টয়ের কোন উক্তি পাওয়া গেলে মাযহাবী ব্যক্তি তা বর্জন করে এবং নিজ ইমামের কথাকে তার উপর প্রাধান্য দেয়- তার এহেন আচরণই নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ ফাসেদ (নষ্ট) হওয়ার নির্দেশ বহন করে। একথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ইমাম চতুষ্টয় ও অন্যান্য আলেমগণের অনুসারী যে কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই ফতওয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে। উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য অনুসারে ফত্ওয়া গ্রহণকারী ও প্রদানকারী কারুর উপরই ইমাম চতুষ্টয়ের কাউকে নির্দিষ্টভাবে মেনে চলা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে নিজ দেশ কিংবা অন্য কোন দেশের হাদীসকে নির্দিষ্টভাবে মেনে চলাও কোন আলেমের উপর ওয়াজিব নয়। বরং কোন হাদীসের বর্ণনাকারী হেজাযবাসী বা ইরাকবাসী, সিরিয়াবাসী বা মিশরবাসী বা ইয়ামানবাসী- যারাই হোক না কেন হাদীসটি ছহীহ হলেই তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে সুপ্রসিদ্ধ সাত ক্বারীর কোন একজনের ক্বেরাআতকে নির্দিষ্টভাবে মেনে চলাও কোন মানুষের উপর ওয়াজিব নয়। বরং কোন ক্বেরাআত যদি কুরআনের নক্সার সাথে মিলে, আরবীর দিক থেকে শুদ্ধ হয় এবং তার সনদও ছহীহ হয়- তাহলে সে ক্বেরাআত পাঠ করা জায়েয হবে। সে ক্বেরাআত দ্বারা ছলাত আদায়ও সর্বসম্মতিক্রমে ছহীহ হবে। এ অভিমত আবুল বারাকাত ইবনু তাইমিয়াহ্ পোষণ করেন। তাই বলে- প্রত্যেক মাযহাবের পচা পচা মাস্আলাগুলো খুঁজে বের করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করা কিন্তু কারোর জন্য উচিত হবে না। বরং সাধ্যানুসারে তার উপর হক্বের অনুসরণই ওয়াজিব- আর এটাই হচ্ছে হক্ব (পথ)। আল্লাহর নিকট তারই তৌফীক্ব কামনা করি।

পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ মাযহাবগুলোর ছড়িয়ে পড়ার কিছু কারণ আছে- আমার জানা মতে তারই কয়েকটি কারণ আমি এখানে উল্লেখ করব। যাতে করে বিবেকবান বা উপস্থিত অন্তঃকরণে শ্রবণকারীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

তাওয়ারিখে রয়েছে- আহমাদ মুক্বরী মাগরেবী স্বীয় "নাফ্হাতুত্ ত্বীব মিন গুছনিল্ আন্দালুস আর্রাত্বীব" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ মরক্কোবাসীদের ইমাম মালেকের (রহ.) মাযহাব গ্রহণের কারণ হচ্ছে এই যে, মরক্কো ও স্পেনবাসীরা প্রথমদিকে আর সিরিয়াবাসীরা সিরিয়ার বিজয় লগ্ন থেকে ইমাম আওযাঈর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। স্পেনে উমাইয়্যা বংশের তৃতীয় গভর্নর আল হাকাম বিন হিশাম বিন আব্দুর রহমান আদ্দাখেলের শাসনামলে ফত্ওয়া পরিবর্তিত হয়ে মালেক বিন আনাস ও মদীনাবাসীর মতের স্বপক্ষে চলে যায়। হাকামেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং তারই রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি এটি করেন। কিন্তু কী কারণে তিনি এরকম করেছেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মত এই যে, স্পেনের আলেমগণ মদীনা ভ্রমণে যান। অতঃপর যখন তাঁরা ফিরে এসে ইমাম মালেকের (রহ.) ফযীলত, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুমহান মর্যাদার কথা তুলে ধরেন, তখনই স্পেনবাসীরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর মাযহাব গ্রহণ করে নেয়। অন্য এক দুর্বল মতে বলা হয় যে, ইমাম মালেক (রহ.) কোন স্পেনবাসীকে স্পেনের বাদশার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি বাদশার চরিত্র বর্ণনা করে। সে সময়ের আব্বাসীয়গণের চরিত্র সন্তোষজনক ছিল না। তাই ইমাম মালেক (রহ.) লোকটির মুখে বাদশার চরিত্রের কথা শুনে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইমাম মালেক (রহ.) সংবাদদাতাকে বলেন যে, মহান আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন তিনি তোমাদের সেই বাদশা দ্বারা আমাদের এ হারাম (মদীনাকে) অলংকৃত করেন। স্পেনের বাদশার নিকট এ সংবাদ পৌছে। তার সাথে যুক্ত হয় ইমাম মালেকের (রহ.) সম্মান ও দ্বীনদারী। কাজেই

বাদশাহ তাঁরই (ইমাম মালেকেরই) মাযহাব গ্রহণ করতে মানুষকে বাধ্য করেন এবং ইমাম আওযাঈর মাযহাব ত্যাগের নির্দেশ দেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অতঃপর মরক্কোর শাসকগণ ঐকমত্যে পৌছেন যে, ইবনুল ক্বাসেমের মতানুসারেই বিচার ও আমল করা হবে, অন্য কারো মতানুসারে নয়। অতএব ফলকথা হলো, মাযহাবসমূহ শাসকদের খেলার বস্তু ও রাজনীতিতে পরিণত হয়। কাজেই ভেবে দেখুন।

মাছূমী বলেন, মাযহাব ও ত্বরীকা সমূহের উৎপত্তির কারণ যদি আপনি জানতে চান, তাহলে ইবনে খালদুনের তারিখের ভূমিকা পড়ুন। তিনি সেখানে এ সম্পর্কে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি বলেন- সর্বগ্রাসী রাজনীতি ও স্বার্থপর অনারবগণের রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণই হচ্ছে মাযহাব সমূহের উৎপত্তি ও প্রসারের মূল কারণ। অতএব সতর্ক হোন।

"এগাছাতুল্ লাহ্ফাম্ মিন্ মাকায়েদিশ্ শায়ত্বান" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন– মানুষকে একই ঢং, একই পোষাক পরিধান, নির্দিষ্ট চালচলন, নির্দিষ্ট শায়খ (পীর) গ্রহণ, আবিষ্কৃত ত্বরীক্বা ও মাযহাব নির্দিষ্টভাবে গ্রহণের নির্দেশ দান হচ্ছে শয়তানের একটি অন্যতম চক্রান্ত। ফরযকে আঁকড়ে ধরার মত করে এগুলোকে আঁকড়ে ধরা তাদের উপর ফরয করে দেয়। যে ব্যক্তি তা করে না তার প্রতি দোষারোপসহ নিন্দাও করা হয়। নির্দিষ্ট মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ এবং বিভিন্ন খোরাফী ছূফী ত্বরীক্বাপন্থীরা এরূপ কাজ করে থাকে। যেমন- নাক্শবান্দিয়াহ, ক্বাদেরীয়াহ, (চিশতিয়াহ, মুজাদ্দিদিয়াহ) সহরওয়ারদিয়াহ্, শায্লিয়াহ্, তীজানিয়াহ্ ইত্যাদি দলের লোকেরা। অতএব সাবধান থাকুন, তাদের পক্ষপাতিত্ব ও তাক্বলীদ থেকে সতর্ক হোন। তারা শরীয়তের হক্বীক্বতকে (নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত শরীয়তী রহস্য) কে পাশ কাটিয়ে রসমের (ভাব ভঙ্গির) সুরক্ষায় মেতে উঠেছে। ফলে সমস্ত বিদআতী রসমের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে তারাই। তারাই ফেক্বাহবিদ ও হক্বীকতবাদীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। যে ব্যক্তি

রাসূলের (ﷺ) ত্বরীকা ও চরিত্রে গভীরভাবে দৃষ্টি দিবে, সে রাসূলের (ﷺ) ত্বরীক্বাকে এদের ত্বরীকার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখতে পাবে। অনর্থক কষ্ট করা ও নিজ রব্বের নির্দেশের বাইরে কারো নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রাসূলের (ﷺ) ত্বরীকায় নেই। অতএব রাসূলের (ﷺ) ত্বরীক্বা ও এদের ত্বরীক্বার মধ্যে দূর ব্যবধান রয়েছে।

মাছূমী বলেন- ইসলামের পরিপন্থী ও মুসলমানদের বিভক্তকারী বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি সম্পর্কে আপনি যদি জানতে চান, তাহলে "এগাছাতুল্ লাহ্ফান মিন মাকায়েদিশ্ শয়ত্বান" গ্রন্থটি পড়ুন- বিশেষ করে গ্রন্থটির শেষাংশটুকু পড়ুন। সেখানে ইবনে সীনা, নূছাইর তূসী, উবাইদী ও ফাত্বেমীদের শরীয়ত কলূষিত করার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মোটকথা, ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন মাযহাব ও ত্বরীক্বায় বিভক্ত করার মাধ্যমেই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সক্ষম হয়েছে।

আবু শামাহ্ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ইমাম শিহাবুদ্দীন আব্দুর রহমান (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরী সন) স্বরচিত গ্রন্থ "আল-মুআম্মাল লিররাদ্দি ইলাল্ আমরিল আউওয়াল"এ বলেন- মানুষ কুরআনের সূরা মুখস্থ করে এবং কিছু ক্বেরাআত নক্বল করে ভাবছে যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট হয়েছে। এমনিভাবে হাদীসের কিছু কিতাব উস্তায্দের নিকট থেকে শুনে নেওয়াকেই ইলমে হাদীস মনে করছে। অথচ সে উস্তায্গণের অধিকাংশজনই তাদের থেকে (হাদীস বিদ্যায়) বেশী মূর্খ। তাদের কেউ কেউ আবার মানুষের তুচ্ছ ব্রেইন, পচা চিন্তা ভাবনা ও স্বমাযহাবী ব্যক্তির কথা নক্বল করেই যথেষ্ট জ্ঞানার্জন হয়ে গেছে ভাবছে। কোন (মাযহাবী) বিশেষজ্ঞকে মাযহাব শব্দের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে- তিনি উত্তরে বলেন- এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তিত দ্বীন বা ধর্ম।[১৬]

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন "

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾

[১৬] অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম পরিবর্তিত হয়ে মাযহাবে পরিণত হয়েছে। না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক।

অর্থ " তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে নিজেরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

[সূরা রূম ৩১-৩২]

তারপরও তাঁর ধারণা যে, তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। অথচ আল্লাহর নিকট ও দ্বীনের আলেমদের নিকট তিনি মূর্খদের থেকেও অধিক মূর্খ ছাড়া কিছুই না।

উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় এও আছে যে, অন্যান্য মাযহাবগুলো বাদ পড়ে যখন চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করে, তখন মাযহাবের অনুসারীদের স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকী সকলের মূল লক্ষ্য মাযহাবের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়। ফলে তারা তাক্বলীদ করতে শুরু করে। অথচ ইতোপূর্বে রাসূলগণ ব্যতীত অন্য করো তাক্বলীদ করা হারাম ছিল। আর এ তাক্বলীদের ফলে নিজ ইমামগণের উক্তিগুলো তাদের নিকট কুরআন-হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীর অর্থ- যা তিনি ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾

অর্থ ঃ "তারা নিজ পাদ্রী ও দরবেশদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে।" [সূরা তাওবাহ ঃ ৩১]

এ কথাগুলোর সংগ্রহকারী আবু আব্দিল কারীম ও আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ সুলতান আল মাছূমী বলেন- আমার নিকট প্রাচ্যের সর্বশেষ দেশ জাপান থেকে মাযহাবী তাক্বলীদ সম্পর্কে যে মাসয়ালাটি এসেছিল সে সম্পর্কে আমি এতটুকুই সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করি এবং এতটুকু লেখাই যথেষ্ট মনে করি। কারণ বিন্দু বিন্দু জলই সমুদ্রের সৃষ্টি করে। আল্লাহ আয্যা ও জাল্লার নিকট প্রার্থনা করি- তিনি যেন তাঁর সমগ্র পৃথিবীর বান্দাকে এ পুস্তিকাখানা দ্বারা উপকৃত করেন, আমার এ প্রচেষ্টাটুকু যেন শুধু তাঁরই রেযামন্দির জন্য হয় এবং আমার জান্নাত লাভের জন্য যেন একটি কারণ হয়। মক্কা মুকাররামার আল বুখারিয়া

গলিস্থ নিজ বাটি- যা কা'বা গৃহের সন্নিকটে অবস্থিত। যেখানে অত্র পুস্তিকাখানা ১৩৫৮ হিজরী সালের মুহাররাম মাসের ১৫ই তারিখে লেখা সুসম্পন্ন হয়। আমাদের শেষ প্রার্থনা হোক- সুবহানা রাব্বিকা রব্বিল ইয্যাতে আম্মা ইয়াছিফূন ও সালামুন আলাল্ মুরসালীন অল্হাম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল-আলামীন।

تخمينا وظلما وعلوا ولا يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا التعصب يختلف شدة وخفة وقلة وكثرة من مذهب إلى مذهب آخر.

لو سارت الأمة في العبادة والمعاملة وفق الكتاب والسنة الصحيحة لم تضل ولن تضل، إلا أن بعض المقلدة الأشقياء لايستدلون بالكتاب والسنة إلا لإثبات حتمية التزام التقليد لإمام مذهب معين فقط وقد ألف بعضهم مؤلفات خاصة بذلك بحيث ذكر فيها الأدلة والحجج الكثيرة من الكتاب والسنة على فرضية التقليد وأهميته - فلا حول ولا قوة إلا بالله

وقد ترتب على هذا التعصب أضرار كثيرة على الدين وأهله منذ نشأة هذه المذاهب وقد ذكر المؤلف صورة واقعية لهذا التعصب المذهبي الذي كان من أضراره وخسائره امتناع بعض أهل اليابان عن اعتناق الإسلام بعد استعدادهم له.

عندما عرف برغبة واستعداد هؤلاء لاعتناق الإسلام دعاهم كل أهل مذهب متواجد هناك إلى اعتناق مذهبهم ففوجئوا وترددوا، إذهم أرادوا الإسلام وهم يدعونهم إلى هذه المذاهب، ثم تقاعسوا وانصرفوا عن اعتناق الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون.

قد أرسل عقب هذه الواقعة بعض الأخوة رسالة إلى المؤلف يسألونه عن المذاهب وحقيقتها ومكانتها من الإسلام ومدى حاجة تقليد مذهب معين فكتب إجابة على سؤالهم هذه الرسالة "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة"

وهذه الرسالة قيمة جدا لمعرفة حقيقة المذاهب وعلاقتها بالإسلام ومالها وما عليها فينبغي أن تنتشر هذه الرسالة في أوسط المسلمين عامة وأهل المذاهب الأربعة خاصة لما فيها من فوائد جمة وأسباب الاهتداء إلى جادة الحق ونبذ التعصب.

وقد قام بترجمتها أخي الشقيق مزمل الحق بن عبد السلام باللغة البنغالية ليستفيد بها أهلها ويعرفوا حقيقة هذه المذاهب الأربعة وموقفها من الكتاب والسنة ونصائح الأئمة أنفسهم، أسال الله تعالى أن يعم الفائدة بهذه الترجمة كما عمها بأصلها ويجزي المؤلف والمترجم خيرا ويثقل بها موازين حسناتهم وكذلك من كان لهم علاقة ومساهمة في طباعة ونشر هذا الكتاب.

كتبه/أكرم الزمان بن عبد السلام

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الداعية والباحث العلمي ومدير قسم الدعوة بجمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت، مكتب بنغلاديش -سابقا

مقدمة المراجع

إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فإن الأمة المحمدية أمة واحدة، أمرها ربها بحفظ هذه الوحدة ونهى عن الفرقة قائلا :

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ (آل عمران : ١٠٣)

وهيأ لها أسس هذه الوحدة ومقوماتها، حيث أن ربها وإلهها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة ومصيرها واحد ولكن أبت هذه الأمة إلا الفرقة والافتراق إلا من رحم الله، فتحقق فيها ما قاله رسول الله ﷺ : إن بني إسرائيل وفي رواية : أهل الكتاب تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة (يعني الأهواء) كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية : "فرقة" بدل "ملة" رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه، صحيح الجامع ٥٢١٩ سلسلة صحيحة ٢٠٣، ٢٠٤، ١٣٤٨

لا شك في أن انقسام الأمة الإسلامية إلى المذاهب الأربعة حدث بإرادة الله الكونية وقد عد العلماء الأثبات أهل المذاهب من أهل السنة والجماعة، وقد أودع الله فيها فوائد وأضرارا، فالمحظوظ الأكثر بفوائدها من لا يلتزم بمذهب معين ويكون حرا بينها، فكلما يوجه إلى المسائل الاجتهادية والمستجدة من الأمور يتتبع في بطون كتب جميع المذاهب فيختار أصح الحلول وأصوبها وأقواها، وهذا لا يمكن لمقلد مذهب إمام معين فإنه حاطب الليل ليس له حق الاختيار والتمييز بل كل ما جاء في المذهب لابد له من قبوله من غير أن يلتفت إلى صحتها وبطلانها وبهذا يكون المذهب مضرا في حقه ومفسدا عليه بل قد يبلغ التعصب المذهبي ببعض أهل المذاهب بلغ بهم إلى درجة لا يقلون انحرافا وفسادا في العقيدة والعمل من أهل الفرق الضالة.

حتى ينطبق على كثير منهم قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ (التوبة ٣١) حيث تجد كثيرا منهم إذا أقمت عليه الحجة في مسئلةما بآية قرآنية ثابتة أوحديث صحيح صريح ثابت مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد فيها لإمامه قول بخلاف ذلك ولو بغير ذكر إسناد إليه تجده يتعصب لقول إمامه، بل يلجأ إلى تأويل ذلك الدليل تأويلا فاسدا بعيدا عن الصواب كل البعد وقد يدعي نسخ ذلك